আধুনিক
পৃথিবী
অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ

Revised and Re-approved by the Board of Secondary Education, West Bengal (Vide Board's letter No. 27633/G dated 21. 10. 63)

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a History Text Book for Class VIII. (Vide Notification No. Syl. 68/55, dated 18th October, 1955, and later Notifications & Circulars up to date.)

আধুনিক পৃথিবী

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

সংশোধিত সংস্করণ

অমূল্যনাথ লাহিড়ী
প্রধান-শিক্ষক
পার্ক ইন্‌স্টিটিউসন, কলিকাতা

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ— কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেনেসাঁস ও ধর্মবিপ্লব

রেনেসাঁসের অর্থ—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে প্রাণের এক প্রবল আবেগ জাগিয়াছিল। তাহার ব্যাপক ও বিচিত্র প্রকাশের নাম দেওয়া হইয়াছে 'রেনেসাঁস' বা পুনর্জন্ম। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার মধ্যযুগের মানুষের দৃষ্টি বহুদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; তাহা ধীরে ধীরে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মানুষের মন ধর্মের বিধিনিষেধ ও ঐতিহ্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইল। গ্রীক ও রোমক শিল্পের পুনরুদ্ধারের ফলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে বিপ্লব আসিল। পুরাতন পুঁথিপত্র সহজলভ্য হওয়ায় পণ্ডিতেরা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে জীব ও জড়-জগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। মানুষ আবিষ্কার করিল কত নূতন গ্রহ-তারা, দেশ-মহাদেশ; আবিষ্কার করিল নিজের স্বরূপ ও সম্ভাবনা। লোকে ভাবিতে শিখিল, যুক্তির দ্বারা বিচার করিতে আরম্ভ করিল। সৌন্দর্য ও আনন্দকে তাহারা পাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল না, বরং জীবনকে সব দিক দিয়া উপভোগ করিতে চাহিল। রেনেসাঁসের সমস্ত কীর্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবমনের অসীম কৌতূহল, মানব-কল্পনার বহুমুখী ঐশ্বর্য, দুর্জয়কে জয় করিবার দুঃসাহসিক আকাঙ্ক্ষা। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতি ইউরোপ

হারাইতে বসিয়াছিল, এখন সেই সংস্কৃতির প্রেরণাতেই আসিল এক নূতন জাগরণ। সেই জন্যই 'পুনর্জন্ম' নামটির সার্থকতা।

দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস—কিন্তু ইতিহাসে কোন আন্দোলনই আকস্মিক নয়। বহুদিন ধরিয়া এই ভাবপ্লাবনের আয়োজন চলিতেছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্ক-আক্রমণে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্তান্তিনোপলের পতন হয়। কেহ কেহ এই তারিখকেই রেনেসাঁসের সূত্রপাত বলিয়া ধরেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগেই রেনেসাঁসের লক্ষণগুলি অঙ্কুর রূপে দেখা দেয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সুরু হয় এবং নগর-সভ্যতা গড়িয়া উঠে। স্পেন হইতে আসে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব। প্যারিস, বোলোনা প্রভৃতি নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলে। চিন্তাজগতের সেই আন্দোলন রূপ পায় দান্তের অমর কাব্য 'ডিভিনা কমেডিয়া'তে (The Divine Comedy), টমাস অ্যাকুইনসের দর্শনে এবং গথিক গীর্জার গগনস্পর্শী মহিমায়। এ যুগে ফ্রান্সিসের মত মরমী সন্ত ও রোজার বেকনের মত যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক একই সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথাগত ধর্মের সহিত নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে গিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস ব্যর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেবল অ্যারিস্টটলের চর্বিত-চর্বণ চলে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অপরাধে প্যারিসের প্রখ্যাত অধ্যাপক আবেলার্ডের কঠোর শাস্তি হয়।

পেত্রার্কা ও মানববাদ—চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সৃষ্টির উৎসমুখ আবার খুলিয়া গেল। ইতালীর নগরগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন বাড়িতেছিল। সেখানে এক ধনী বণিক-শ্রেণীর আবির্ভাব হয়,

যাহাদের শিল্প ও সাহিত্য বুঝিবার মতো অবসর ছিল, শিল্পী ও সাহিত্যিক পোষণ করিবার মতো অর্থ ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মধ্যে ইহারা খুঁজিয়া পাইল নব সৃষ্টির আদর্শ। ইতালী ও সিসিলির সর্বত্র প্রাচীন শিল্পের অসংখ্য নমুনা ছড়ানো ছিল। সেই ধ্বংসস্তূপ হইতে রোমের অতীত গৌরবের কাহিনী পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের পণ্ডিত ও সাহিত্যিক পেত্রার্কা।

পেত্রার্কা পুরানো পুঁথি, মুদ্রা, অনুশাসন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বাল্যকালে লাতিন ভাষা আয়ত্ত করিবার পূর্বেই সিসেরোর রচনা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন মূল গ্রীক ভাষায় হোমারের রচনা পড়িবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। লাতিন ও ইতালীয় ভাষায় তিনি নিজে কবিতা লিখিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি মানববাদ (humanism) প্রচার করেন। তাহার প্রধান কথা হইল—মানুষকে কোন অপার্থিব স্বর্গীয় আদর্শে বিচার না করিয়া মানুষের মাপকাঠিতেই বিচার করিতে হইবে, তাহার ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে হইবে, তাহার সৃষ্টি হইতে প্রেরণা লাভ করিতে হইবে ও সম্ভাবনাকে দিকে দিকে অবারিত করিতে হইবে। মানববাদ রেনেসাঁসের সাহিত্য ও শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। সে দিক দিয়া পেত্রার্কা এক নূতন ভাব-গঙ্গার ভগীরথ।

খ্রীষ্ট ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক ভোগ-স্পৃহাকে পাপ বলিত, অথচ পুরোহিত ও যাজক শ্রেণীর মধ্যে অন্যায়ের অন্ত ছিল না। পেত্রার্কার অনুসরণ করিয়া বোকাচিয়ো তাঁহার 'ডেকামেরন' গ্রন্থে ধর্মের ভণ্ডামি তীব্র বিদ্রূপে জর্জরিত করিয়া দিলেন। আবার গ্রীক ভাষা শিখিয়া হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র অনুবাদও তিনি করিলেন।

পুথি-সংগ্রহ—পেত্রার্কা ও বোকাচিয়োর আদর্শে পুরাতন পুথি সংগ্রহ ও নকল করিবার ধূম পড়িয়া গেল। কন্‌স্তান্তিনোপলের পতনের পর দলে দলে গ্রীক পণ্ডিত ইতালীর বিভিন্ন দরবারে আশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। তাঁহারা সঙ্গে আনিলেন অনেক পুঁথি, খুলিয়া বসিলেন গ্রীক পঠন-পাঠনের জন্য বিদ্যালয়। মুদ্রণ-যন্ত্রের উন্নতির ফলে পুঁথিগুলি সহজলভ্য হইল। এবিষয়ে অগ্রণী ছিল ফ্লোরেন্স, রোম, মিলান ও ভেনিস। ফ্লোরেন্সের কসিমো ও লরেঞ্জো মেদিচি, পোপ দশম লিও, মিলানের লুডোভিকো ইলমোরো কেবল রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না—তাঁহারা সর্বদা কবি, শিল্পী ও দার্শনিক পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। কসিমো ছিলেন প্রাচীন দার্শনিক প্লেটোর ভক্ত, লরেঞ্জো নবীন শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর পৃষ্ঠপোষক।

রেনেসাঁস সাহিত্য—এ যুগের ইতালীয় সাহিত্যে কয়েকটি নূতন রীতি প্রবর্তিত হয়। পেত্রার্কা চতুর্দশপদী কবিতা লেখেন। বোকাচিয়ো উপন্যাস লিখিবার রীতি প্রবর্তন করেন, চেলিনি আত্মজীবনী রচনার পথ প্রদর্শন করেন। তবে এখানে লাতিন সাহিত্যের অনুকরণই ছিল বেশী। রেনেসাঁস কাব্য ও নাটকের পূর্ণতম বিকাশ হয় পরে ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে। সেক্সপীয়ারের নাম জগদ্বিখ্যাত, তাঁহার নাট্যাবলী সমুদ্রের মত

সেক্সপীয়ার

বিশাল ও গভীর। সেই চরিত্র-চিত্রশালায় ভীষণ, মধুর, কোমল, কঠোর, মহৎ ও ঘৃণিত—মানুষের কোন রূপই বাদ পড়ে নাই। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার অনবদ্য ভাষার যাদু সেই আবেগ ও অনুভূতির রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে রামধনুর বিচিত্র বর্ণে। এই প্রসঙ্গে কবি স্পেন্সার, প্রবন্ধকার বেকন ও নাট্যকার মার্লোর নামও উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস ও রাজনীতি-সাহিত্যে ফ্লোরেন্সের মেকিয়াভেলির নাম উল্লেখযোগ্য। 'প্রিন্স্' নামক পুস্তকে মেকিয়াভেলি যে আদর্শ নরপতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার যেন কোন প্রচলিত সংস্কার মানিবার দায়িত্ব নাই। মেকিয়াভেলির মতে উপায়ের ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যে উপায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযোগী তাহাই ভাল, যাহা নয় তাহা মন্দ। আধ্যাত্মিক রীতিনীতি রাজনীতির ক্ষেত্রে অচল, একথা সাহসের সঙ্গে তিনিই প্রথম প্রচার করেন।

মেকিয়াভেলি

রেনেসাঁস শিল্প—কিন্তু শিল্পে ইতালী ইংল্যাণ্ড কেন, গ্রীসকেও হার মানাইয়াছে। মধ্যযুগের শিল্প ছিল একান্তভাবে ধর্ম-নির্ভর। তাহা ক্রমশঃ প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল, বাস্তব জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। খ্রীষ্ট ও তাঁহার সন্তদের জীবনকাহিনীতে পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরকের রহস্য ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া মধ্যযুগের শিল্পী প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নরদেহের লাবণ্য

ভুলিয়াছিল। রেনেসাঁসের শিল্পী শিল্পকে এই অবাস্তব জগৎ হইতে মাটির পৃথিবীতে নামাইয়া আনিল, তাহার মধ্যে সঞ্চার করিল রক্তের উত্তাপ ও হৃদয়ের স্পন্দন। গ্রীক বাস্তববাদ ও খ্রীষ্টান আদর্শবাদের সার্থক সমন্বয় এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পে ঘটিয়াছিল।

রেনেসাঁস স্থাপত্য—রেনেসাঁস স্থপতিরা রাজা ও অভিজাতদের প্রাসাদ-নির্মাণে মন দিলেও গীর্জা-পরিকল্পনায় কম দক্ষতা দেখান নাই। ফ্লোরেন্সের ডুওমো (Duomo) ও রোমের সেণ্ট পীটার গীর্জা ব্রুনেলস্কি, ব্র্যামান্টি ও মাইকেল এঞ্জেলোর (১৪৭৫-১৫৬৪) প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া রচিত মিলানের ক্যাথিড্রাল তাহার সহস্রাধিক শুভ্র মর্মর-চূড়া ও শত শত স্তবনম্র সন্তমূর্তি লইয়া যেন ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করিয়াছে। ফ্লোরেন্সের ভেক্কিয়ো প্রাসাদ ও ভেনিসের ডোজের প্রাসাদের অভ্যন্তরে দেখা যায় মর্মর-মণ্ডিত প্রশস্ত ঘর ; দেওয়ালে ও ছাদে সুদৃশ্য চিত্রাবলী ; কাষ্ঠ, গজদন্ত ও বিচিত্র বর্ণের পাথরের অপূর্ব কারুকার্য-খচিত আসবাবপত্র ; উত্তাপ দূর করিবার জন্য নয়নাভিরাম ফোয়ারা।

সেণ্ট পীটার গীর্জা (রোম)

রেনেসাঁস ভাস্কর্য—ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গিবার্টি, দোনাতেল্লো ও

মাইকেল এঞ্জেলোর নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। ফ্লোরেন্সের একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত দরজায় গিবার্টি বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে এমন সুন্দর খোদাই করিয়াছিলেন যে লোকে তাহাকে 'স্বর্গের দরজা' বলিত। দোনাতেল্লোর ডেভিড ও সেণ্ট জর্জের মূর্তিতে মানবদেহের অনবদ্য সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, গ্রীক বীর্যের সহিত মিশিয়াছে খ্রীষ্টান বিশ্বাস। মাইকেল এঞ্জেলোর মতো ভাস্কর আজও জন্মে নাই। ষোল বৎসর বয়স হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ষাট বৎসর তিনি আত্মহারা হইয়া শিল্প-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লরেঞ্জো মেদিচি ও পোপ জুলিয়াস। তাঁহার 'ডেভিড' ও 'মোজেস' এবং মেদিচি চ্যাপেলে রক্ষিত 'দিবা ও রাত্রি'র মূর্তি দেখিলে মনে হয় স্বয়ং বিধাতা যেন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। এমন প্রবল পৌরুষের ব্যঞ্জনা, এমন আদিম প্রাণশক্তির আবেগ আর দেখা যায় নাই।

মাইকেল এঞ্জোলো

মোজেস্ (মাইকেল এঞ্জেলো কর্তৃক নির্মিত)

রেনেসাঁস চিত্র— দেওয়ালের সদ্যকরা ভিজা

আস্তরে জলে গোলা রঙ দিয়া আঁকা ছবিকে বলা হয় 'ফ্রেস্কো'। রঙের গুঁড়া তেলে মিশাইয়া পাট বা সূতার চটে আঁকা ছবিকে বলা হয় তৈলচিত্র। ফ্রেস্কোর জন্য বিখ্যাত ছিল ফ্লোরেন্স, তৈলচিত্রের জন্য ভেনিস। এ যুগের প্রত্যেক চিত্রকরই বাস্তবকে নিখুঁত ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিত। মধ্যযুগের শিল্পীরা পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল—অর্থাৎ দূরের ও নিকটের মানুষ তাহারা একই ভাবে আঁকিত; সমুখ, পিছন বলিয়া কিছু ছিল না। দূরত্বের তারতম্য অনুসারে চিত্রিত বস্তুর যথাযথ বিন্যাস এবং স্থূলত্বের আভাস সঞ্চার এই প্রথম সম্ভব হয়।

ফ্লোরেন্সের জত্তো-র (১২৭৬-১৩৩৭) আঁকা মানুষগুলিকে যেন ছোঁওয়া যায়, বত্তিচেল্লি-র ছবিতে নৃত্য-চঞ্চল গতি যেন অনুভব করা

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

রাফেল

যায়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র (১৪৫২-১৫১৯) 'ভার্জিন অব দি রকস্' যেন স্বর্গের দেবী নন, মর্ত্যলোকের স্নেহমুগ্ধা জননী। লিওনার্দোর

'লা জকন্দা' (La Gioconda—'মোনালিসা' নামে খ্যাত) তাহার অধরপ্রান্ত-লগ্ন ঈষৎ হাসির রেখা লইয়া চিরন্তন রহস্যময়ী।
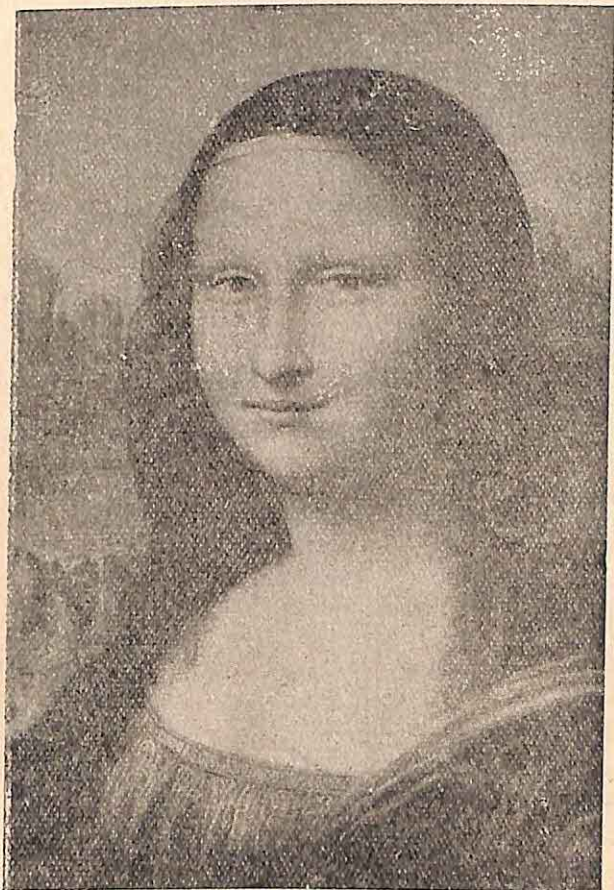
মোনালিসা (লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কর্তৃক অঙ্কিত)

সিস্‌টাইন্ চ্যাপেলের ছাদে ও বেদী-সন্নিহিত প্রাচীর-গাত্রে মাইকেল

এঞ্জেলো 'সৃষ্টির কাহিনী' ও 'শেষ বিচারের দৃশ্য' আঁকিয়াছিলেন—যেমন তাহার রেখার বলিষ্ঠতা, তেমনি ভাবের গভীরতা। রাফেল-এর

ম্যাডোনা (রাফেল কর্তৃক অঙ্কিত)

(১৪৮৩-১৫২০) মাতৃমূর্তিগুলি তো পবিত্র সৌন্দর্যের মধুর প্রতিচ্ছবি। তবে 'স্কুল অব অ্যাথেন্স' প্রভৃতি চিত্রে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনারও পরিচয় মেলে।

ভেনিসের শিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ভেরোনিজ, তিনতরেত্তো ও তিশ্যান্। ইহারা সকলেই অল্পবিস্তর ষোড়শ শতাব্দীর লোক ও অধিকতর বাস্তবপন্থী। ভেনিসের জীবনের ধর্মের প্রভাব ছিল কম, বিলাসের বাহুল্য ছিল বেশী। তাই ভেনিসীয় শিল্পীদের পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি রঙের ঐশ্বর্য ও দেহ-সৌষ্ঠবের পূর্ণতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন। তিশ্যানের 'জনৈক ইংরেজ যুবক', 'পোপ তৃতীয় পল' প্রভৃতি চিত্র জগদ্বিখ্যাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর জভান্নি বেলিনিও 'ম্যাডোনা'র ছবি ভাল আঁকিয়াছেন এবং জর্জনের মত প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব কম চিত্রকরই আঁকিয়াছেন।

পোপ তৃতীয় পল
(তিশ্যান কর্তৃক অঙ্কিত)

রেনেসাঁস শিল্পীদের অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। লিওনার্দো তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার নোটবইয়ে শত শত যন্ত্রের খসড়া পাওয়া গিয়াছে, তার মধ্যে উড়োজাহাজের একটি রেখাচিত্র বিস্ময়কর। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন একাধারে স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর ও কবি।

পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে রেনেসাঁস—রেনেসাঁসের প্রভাব ইতালী হইতে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং দেশভেদে ভিন্ন রূপ নেয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অনুপ্রাণিত হয় সাহিত্য ; হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও স্পেনে শিল্প। বেলজিয়ামের য্যান ভ্যান আইক ক্ষুদ্রাকৃতি ছবি আঁকিতেন, রুবেন্স ছিলেন রঙের রাজা আর ভ্যান

ডাইক আঁকিতেন প্রতিকৃতি। হল্যাণ্ডের রেমব্রাণ্ট প্রতিকৃতি রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। স্পেনের শিল্পীদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এল গ্রেকো, ভেলাসকেথ ও মুরীল্লো। যীশু খ্রীষ্টের জীবন সম্বন্ধে গ্রেকো কয়েকটি অবিনশ্বর চিত্র আঁকিয়াছেন। মুরীল্লোর তুলিতে ধরা পড়ে গরীব-দুঃখী ছেলেমেয়ে। জার্মানীতে ডুবার ও হলবিন রেনেসাঁসের প্রভাবে শিল্প সৃষ্টি করেন। টিউডর রাজ-পরিবার লইয়া হলবিনের ছবিগুলি খুব জীবন্ত।

রেমব্রাণ্ট (স্বহস্ত-অঙ্কিত)

রেনেসাঁস বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের উন্নতির পথে কুসংস্কার ও প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের যে বাধা ছিল রেনেসাঁসের প্রবল আলোড়নে তাহা অনেকটা অপসারিত হয়। কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এতদিনকার প্রচলিত বিশ্বাস উল্টাইয়া দিয়া প্রমাণ করেন যে পৃথিবী গোলাকার। গ্যালিলিও ঘোষণা করেন সূর্য স্থির, পৃথিবী তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। এই দুঃসাহসিক মত প্রচারের জন্য তিনি পুরোহিতদের হাতে শাস্তি পাইতে পাইতে বাঁচিয়া যান। ইহার কিছু পরে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার এবং গণিত ও পদার্থবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হইল এই ভাবে।

ধর্ম বিপ্লবের ভূমিকা—যে মানুষ চিন্তা ও সৃষ্টির জগতে মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, ধর্মের ক্ষেত্রে তাহার বিধিনিষেধের নাগপাশ ভাল লাগিবে কেন? বস্তুত অনেক দিন হইতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘনাইতেছিল। ইংল্যাণ্ডের জন উইক্লিফ, বোহেমিয়ার জন হাস পোপের স্বৈরাচার, বিশপদের আদর্শ-ভ্রষ্টতা ও চার্চের অসংখ্য অর্থহীন বিধান সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু উইক্লিফের অনুচর ললার্ডদের কঠোরভাবে দমন করা হয়। জন হাসকে করা হয় জীবন্ত দগ্ধ। রেনেসাঁসের সময় আবার সে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

এতদিন অনেকেই গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় রচিত আদি বাইবেল পড়িতে পারিত না, পুরোহিতের ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে হইত। এখন দেশে দেশে চল্‌তি ভাষায় ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ হওয়াতে সাধারণ লোকে স্বাধীন বিচারের সুযোগ পাইল। পুরোহিতদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া ইরাস্‌মাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যীশু ও তাঁহার শিষ্যদের সহজ সরল অথচ পবিত্র ও মধুর জীবনের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লোকে তাহার সহিত তুলনা করিল পোপদের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও উদ্দাম ভোগ-বিলাস আর বহু পুরোহিতের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা। আপনার অজ্ঞাতসারেই লোকে ধর্ম-সংস্কারের কথা ভাবিতে লাগিল।

মার্টিন লুথার—এই সংস্কারের আবেগকে প্রবল আন্দোলনে পরিণত করিলেন জার্মানীর মার্টিন লুথার। তাঁহার জন্ম হয় ১৪৮৩ সালে এক দরিদ্র খনি-মজুরের ঘরে। এরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে মানববাদের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে। অধ্যয়ন-শেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াও তিনি শান্তি পাইলেন না। মূল বাইবেল ও সেণ্ট অগস্টাইনের রচনা পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল নিরন্তর মালা জপিলে বা বেদীর সম্মুখে ধূপদীপ জ্বালাইলেই ভগবৎ-করুণা পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই অবিচল ও আন্তরিক বিশ্বাস। রোমে গিয়া তিনি

পোপের আড়ম্বর ও বিলাস প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আরও বীতরাগ হন।

এই সময় পোপ টাকা আদায় করার এক নূতন উপায় বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাড়পত্র, কিনিলে পাপী—এমন কি, যাহারা ভবিষ্যতে পাপ করিতে পারে—তাহারা নাকি শাস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপের লোক ছাড়পত্র বেচিবার জন্য জার্মানীতে আসিলে লুথার উইটেনবার্গ গির্জার দরজায় পঁচানব্বই দফায় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন।

মার্টিন লুথার

প্রতিবাদের সংক্ষিপ্তসার হইল—ভগবানের ক্ষমা অর্থ দিয়া কেনা যায় না, যে অন্তরে অন্তরে প্রকৃত অনুশোচনা বোধ করে সেই ক্ষমা পায়।

চার্চের প্রতিক্রিয়া—পোপ এই প্রতিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন। মানুষ যদি নিজের চেষ্টায় মুক্তি পাওয়ার আশা পোষণ করে তবে আর সংঘবদ্ধ পুরোহিতমণ্ডলী—অর্থাৎ চার্চের—প্রয়োজন কি? পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর যাজক পুষিবার অর্থই বা কি? সকলে লুথারের মত গ্রহণ করিলে চার্চের আয়ের পথ রুদ্ধ হইবে। তাই লুথারকে তাঁহার মতবাদ প্রত্যাহার করিতে বলা হইল। জার্মানরা ইহা মানিয়া লইল না। লুথার জার্মান রাজন্যবর্গের কাছে আবেদন জানাইলেন। তাঁহাদের অনেকেরই চার্চের

বিশাল সম্পত্তির প্রতি লোভ ছিল। এই সুযোগে তাঁহারা সে সম্পত্তি নির্বিচারে আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌স্ প্রাচীন ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে লুথার পুরোহিতের অনুশাসনের উপর ব্যক্তিগত বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন। ইহার পর সম্রাটের হাতে শাস্তি এড়াইবার জন্য লুথারের আত্মগোপন ব্যতীত উপায় রহিল না। স্যাক্সনির শাসনকর্তা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। অজ্ঞাতবাসকালে লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন। সে ভাষা এত মনোরম যে পরবর্তী কালে তাহারই আদর্শে জার্মান সাহিত্য গড়িয়া উঠে। লুথারের সমর্থনে জার্মান জনমত এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে কিছুদিনের মধ্যেই লুথারের আর আত্মগোপন করিয়া থাকার প্রয়োজন রহিল না।

লুথারের আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টান সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। যাহারা সংস্কার সমর্থন করিল তাহাদের বলা হইত 'প্রটেস্টাণ্ট' আর যাহারা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পোপের আনুগত্য স্বীকার করিত তাহাদিগকে বলা হইত ক্যাথলিক।

সম্রাট ধর্মসংস্কার মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লুথারের মৃত্যু হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধ সুরু হইল। সম্রাট শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। অগ্‌স্‌বার্গের চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে জার্মানীর ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড রাজ্যের রাজার ধর্মমত অনুসারে প্রজার ধর্মমত স্থির হইবে। জার্মানীর অনেক অংশে তাই লুথার-পন্থীদের স্বধর্মাচরণে কোন বাধা দেওয়া হইল না। ইহার ফলে জার্মানী প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত হইল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি হইল লুথার-পন্থী, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ক্যাথলিক রহিয়া গেল।

জার্মানীর বাহিরে ধর্মবিপ্লব—ধর্মবিপ্লবের ঢেউ ইতিমধ্যে উত্তর ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে লুথারের মত গৃহীত হইল। সুইজারল্যাণ্ডে প্রটেস্টান্ট মতবাদের প্রধান কেন্দ্র হইল জেনিভা সহর। জন ক্যাল্‌ভিন্‌ ছিলেন এখানকার নেতা। তিনি জাতিতে ফরাসী। তিনি ছিলেন গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং আইনে পারদর্শী। প্রটেস্টান্ট মতের অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা দূর করিয়া তিনি এক দৃঢ়সংবদ্ধ ধর্ম-সংস্থা গঠন করিলেন। তাঁহার প্রধান কথা হইল—কোন মানুষ মুক্তি পাইবে কি পাইবে না—সে কথা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পূর্ব হইতেই নির্ধারিত করিয়া রাখেন। ভগবান যাহাকে মুক্তির জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন তাহার আর কোনও ভয় নাই।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খ্রীষ্টানেরা যে সহজ সরল জীবন যাপন করিত ক্যালভিন তাহাই প্রবর্তন করিতে চাহিলেন, দাবী করিলেন ধর্ম-বিশ্বাসের পবিত্রতা ও অনমনীয় শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা-ভঙ্গের শাস্তি সমাজ হইতে বহিষ্কার। ব্যক্তিগত আচরণের সামান্য স্খলনও দমন করা প্রয়োজন। নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ পাপ বলিয়া পরিত্যাজ্য। স্কটল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে ক্যালভিনের কঠোর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডে এবং ফ্রান্সেও তাহার ঢেউ গিয়া পেঁছায়।

ইংল্যাণ্ডে ধর্মবিপ্লব—ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁস আরম্ভ হয় কলেট, টমাস মুর প্রভৃতির নেতৃত্বে। তাহার পর আসিল ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন। রোম যে প্রতি বৎসর বহু অর্থ নানা খাতে ইংল্যাণ্ড হইতে লইয়া যাইত, ঊর্ধ্বতন যাজকগণকে নিয়োগ করিত, ধর্ম-সম্পর্কিত বিচারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দাবী করিত ইহা অনেকের পছন্দ হইত না। রাজা অষ্টম হেনরী প্রথমে পোপের সমর্থক

ছিলেন। কিন্তু রাণী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্য স্ত্রী গ্রহণে পোপের আপত্তি থাকায় বিরোধ আরম্ভ হয়।

পার্লামেন্টকে দিয়া হেনরী যে কয়েকটি বিধান প্রণয়ন করাইলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ধর্মের সংস্কার নয়। পূর্বে নবনিযুক্ত যাজককে প্রথম বৎসরের আয় রোমে পাঠাইতে হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইংল্যাণ্ডের বিচারালয় হইতে রোমের বিচারালয়ে আপীল করা নিষিদ্ধ হইল ও দেশের বিচারালয়েই ধর্মবিষয়ক বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইল। বিশপদের নির্বাচন ও নিয়োগ করিবার ক্ষমতা আসিল রাজার হাতে। হেনরী পোপের নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের পুরোহিত সম্প্রদায়ের শাসক হইয়া বসিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত মঠ বন্ধ করিয়া দিলেন; তাহাদের প্রভূত ভূ-সম্পত্তি সরকারী তহবিলে আনা হইল, কিছু পারিষদদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। তবে হেনরী শেষ পর্যন্ত প্রটেস্টাণ্ট মতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই।

অষ্টম হেনরী

তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথমে প্রটেস্টাণ্ট মতবাদ আরও সক্রিয় হইয়া উঠে। নূতন মত অনুসারে রচিত প্রার্থনাপুস্তক-পাঠ উপাসনার অঙ্গ করা হইল। গির্জা হইতে বেদী ও মূর্তি সরাইবার হুকুম আসে, অন্যান্য ক্যাথলিক ক্রিয়াকাণ্ডও বাতিল হয়। কিছুদিন পর ক্যাথলিক মেরী রাণী হইলে প্রটেস্টাণ্টদের উপর কঠোর নির্যাতন সুরু হয়।

এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডের ধর্মমত স্থায়ী ভাবে নির্ধারিত হইল এবং রাণী সকলকে সেই মত মানিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন। এই আইন-নির্দিষ্ট ধর্ম-ব্যবস্থা মোটামুটি প্রটেস্টাণ্ট; কিন্তু পিউরিটানদের, অর্থাৎ ক্যালভিনের অনুগামী চরমপন্থীদের, এই ব্যবস্থা মনঃপূত হয় নাই। তাহারা আর্চবিশপ ও বিশপের পদ ও ক্ষমতা বহাল রাখিতে রাজি ছিল না। এলিজাবেথ একে রক্ষণশীল ছিলেন, তদুপরি ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ চাহেন নাই। তিনি পিউরিটানদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফলে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম-বিপ্লব অর্ধপথে থামিয়া গেল।

ধর্মবিপ্লবের ফল—ধর্মগত ঐক্য ছিল ইউরোপে মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মবিপ্লবের পর খ্রীষ্টান জগতের সে ঐক্য নষ্ট হইল। ইউরোপের অর্ধেকের বেশী প্রাচীন পন্থা ত্যাগ করিয়া ধর্ম-সংস্কারের আশ্রয় নেয়। প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বীরা কিন্তু বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। বহুদিনের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার ফলে অনৈক্য বাড়িয়া গেল। প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহবিরোধ এবং অবশেষে প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ দেখা দিল। বহু বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। জার্মানী ইহার ফলে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। অনেক হানাহানির পর পরমতসহিষ্ণুতা কতকাংশে স্বীকৃত হয়। ধর্মের মূল উপাদান যে অন্তরের গভীর আবেগ এবং প্রধান লক্ষ্য যে নৈতিক পবিত্রতা এমন বোধ ক্রমশঃ জাগ্রত হইল। ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্ধ মোহ কাটিয়া গিয়া স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত হইল।

	—১৩০৪	পেত্রার্কার জন্ম
	—১৪৫২	লিওনার্দোর জন্ম
	—১৪৫৩	কন্স্তান্তিনোপলের পতন
	—১৪৮৩	লুথারের জন্ম
	—১৪৯২	লরেঞ্জো মেদিচির মৃত্যু, আমেরিকা আবিষ্কার
খ্রীষ্টাব্দ	—১৫০৯	ক্যালভিনের জন্ম
	—১৫১৭	লুথারের বিদ্রোহ
	—১৫২৯-৩৬	ইংল্যাণ্ডে রিফর্মেশন পার্লামেণ্টের অধিবেশন
	—১৫৫৫	অগস্বার্গের সন্ধি
	—১৫৩৬-৬৪	জেনেভায় ক্যালভিন
	—১৫৫৯	এলিজাবেথের ধর্মসংস্কার আরম্ভ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ বিস্তার

আবিষ্কারের প্রেরণা—রেনেসাঁস ও ধর্মবিপ্লবের ফলে মানুষ যেমন চিন্তার রাজ্যে নিজেকে পূর্ণ প্রকাশ করিতেছিল তেমনি সেই যুগেই নানা ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া লোক বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। 'ক্রুসেড' বা ধর্ম-যুদ্ধের সময় হইতে এই বিস্তার সুরু হইয়াছিল।

ভেনিসের মার্কো পোলো আনুমানিক ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করিয়া সুদূর চীনে যান। চীনে প্রায় ষোল বৎসর কাল থাকিয়া তিনি জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ঘুরিয়া দেশে ফেরেন।

তাঁহার রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী বহু পর্যটক ও অভিযাত্রীকে অনুপ্রাণিত করে।

তারপর দিকনির্ণয়-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বাহির করিয়া সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান নির্দেশ করা সম্ভব হইল, সুন্দর সুন্দর মানচিত্র রচিত হইল। ভেনিসের নাবিকরা তৈয়ারী করিল উন্নত ধরণের অর্ণবপোত। সমুদ্রযাত্রা আর আগেকার মত ভয়াবহ রহিল না।

সমুদ্রযাত্রার পিছনে যে শুধু রেনেসাঁস-সুলভ কৌতূহল ও রোমাঞ্চকর জীবনের মোহ ছিল তা' নয়, অর্থলোভও ছিল। প্রাচ্য দেশ হইতে রেশম, মসলিন, মশলা প্রভৃতি যে সব দুর্লভ সামগ্রী আসিত—আরবদের হাতে ছিল তাহার একচেটিয়া ব্যবসা। ভেনিসের বণিকরা আরবদের কাছে কিনিয়া আবার তাহা ইউরোপের বাজারে বেচিত। মুসলমানরা বড় বেশী লাভ রাখিত, তদুপরি তাহাদের সহিত খ্রীষ্টানদের ধর্ম-যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। সুতরাং স্বার্থের তাগিদে প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে যাইবার একটি নিরাপদ পথ ইউরোপীয়রা খুঁজিতেছিল।

প্রথমে মনে হইয়াছিল জেনোয়া বা ভেনিস সে পথ আবিষ্কার করিবে, কারণ ইতালীতে তাহারাই ছিল বড় ব্যবসাদার। কিন্তু ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকা ঘুরিয়া এশিয়া পৌঁছিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইল জেনোয়া। কনস্তান্তিনোপলের পতনে ভেনিসের ক্ষমতা-বিস্তার বাধা পাইল। এখন হইতে আটলান্টিকের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি ভৌগোলিক অভিযানে বেশী উৎসাহ দেখাইতে লাগিল—যদিও ইতালীর নাবিকরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্ষেত্রে অভিযানগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

পর্তুগীজ অভিযান—সমুদ্রযাত্রায় এখন অগ্রণী হইল পর্তুগাল। প্রথম পথপ্রদর্শক রূপে পর্তুগালের নাবিক-প্রিন্স হেনরীর (১৪১৫–

১৪৬১) নাম করিতে হয়। আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া তাঁহার জাহাজ কত নূতন দ্বীপ ও দেশ আবিষ্কার করে। তিনি এক নূতন ধরণের হাল্কা তিন মাস্তুলের জাহাজ নির্মাণ করেন। মাদিরা, অ্যাজোরস্, কেপ ভার্ডিতে পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপিত হইল। গোল্ড কোষ্টে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে রাষ্ট্র উপনিবেশ বিস্তারের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া আফ্রিকা ঘুরিয়া প্রাচ্য দেশে যাইবার পথের সন্ধান পাইলেন। এতদিনে প্রাচ্যের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত হইল। এই পথে ইউরোপীয়দের পূর্বদেশে যাওয়া-আসাতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য ছিল না। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটের বন্দরে নোঙর ফেলিলেন। এশিয়ার ইতিহাসে সুরু হইল এক নূতন যুগ।

ভাস্কো ডা-গামা

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত—ব্যবসার মালপত্র রাখিবার জন্য নিরাপদ জায়গা দরকার হইল। তাহাকে বলা হইত ফ্যাক্টরী বা কুঠি। আবার দস্যুতস্কর বা শত্রুর হাত হইতে কুঠি রক্ষা করিতে গিয়া দুর্গ নির্মাণ করিতে হইল। এই ভাবে বাণিজ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়া গেল সাম্রাজ্যের তাগিদ। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকা ও

এশিয়ার বিক্ষিপ্ত পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আরব ও মিশরীদের নৌযুদ্ধে হারাইয়া পর্তুগাল ভারত সমুদ্রের উপর একাধিপত্য কায়েম করিল। ভারতের পশ্চিম-উপকূলে গোয়া, দমন, দিউ এবং সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মালাক্কা ও মোলাক্কা লইয়া পর্তুগালের সমুদ্র-নির্ভর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। তাহার রাজধানী ছিল গোয়া। ভারতের মসলিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা, চীনের রেশম, আফ্রিকার দাস বিক্রয় করিয়া পর্তুগাল প্রভূত লাভ করিতে লাগিল।

আমেরিকা আবিষ্কার—স্পেনও প্রাচ্য দেশে যাইবার পথ খুঁজিতেছিল। এমন সময় পর্তুগালের কাছে সাহায্য চাহিয়া বিফল হইয়া স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার দরবারে আসিলেন জেনোয়ার এক নাবিক। নাম তাঁহার ক্রিস্টোফার কলম্বাস। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে আটলান্টিক পাড়ি দিয়া ভারতবর্ষ ও চীনদেশে সোজা পৌঁছিবার পথ আছে। তিনটি ছোট জাহাজ এক দুঃসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়া উত্তাল আটলান্টিকের বক্ষে নিরুদ্দেশে ভাসিল। বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া কলম্বাস যেখানে অবতীর্ণ হইলেন তাহার নাম বাহামা দ্বীপ। কিন্তু অতি নিকটে ছিল চীন বা ভারত নয়, বিরাট এক অজ্ঞাত মহাদেশ।

কুড়ি বছর ধরিয়া স্পেনের নাবিকগণ ইহার উপকূলভাগ চষিয়া বেড়াইল, পানামা যোজক পার হইয়া বালবোআ আবিষ্কার করিলেন এক অজানা সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর। ফ্লোরেন্সের বণিক আমেরিগো ভেস্‌পুচি এই নূতন মহাদেশ সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। একজন জার্মান ভূগোলবিদ্ তাঁহার নামেই এই দেশের নাম দিলেন আমেরিকা।

আমেরিকা আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাচীন গ্রীস রোম হইতে আরম্ভ করিয়া রেনেসাঁস পর্যন্ত ইউরোপের

জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান কলম্বাস

সভ্যতার কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তাহা আটলান্টিক অঞ্চলে সরিয়া গেল।

মেক্সিকো ও পেরু বিজয়—ইহার অল্পদিন পরে কর্টেজ আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে মেক্সিকোর প্রাচীন ও প্রভূত ঐশ্বর্যশালী অ্যাজটেক সাম্রাজ্য অধিকার করেন (১৫২১), পিজারো অধিকার করেন দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত পেরুর ইন্‌কা সাম্রাজ্য (১৫৩২)। মেক্সিকো, পেরু ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ লইয়া স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। শত শত বৎসর ধরিয়া আমেরিকার আদি বাসিন্দা মায়া ও ইন্‌কা রাজগণ বিপুল স্বর্ণস্তূপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এখন বন্যার স্রোতের মত তাহা স্পেনে প্রবাহিত হইল। এদিকে পর্তুগাল নিগ্রোদাসের যোগান দেয় এবং নিজেও ব্রেজিলে উপনিবেশ স্থাপন করে। পাছে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য লইয়া বিরোধ বাধে সেজন্য পোপ এক অনুজ্ঞা জারী করেন যাহার ফলে আমেরিকা স্পেনের এবং আফ্রিকা ও এশিয়া পর্তুগালের ভাগে পড়ে। অবশ্য পূর্ব ভূখণ্ডে স্পেন পায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম ভূখণ্ডে পর্তুগাল পায় ব্রেজিল।

ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—লুটের ভাগে বঞ্চিত দেশগুলি পোপের অনুজ্ঞা মানিতে রাজি হইল না। আমেরিকা ও এশিয়ার ঐশ্বর্য সকলের চোখ ধাঁধাইয়া দিল। ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড নূতন মহাদেশে স্পেন ও পর্তুগালের একচেটিয়া অধিকার অস্বীকার করিল।

জেনোয়াবাসী, কিন্তু ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী, জন কেবট ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার কেপ ব্রেটনে পৌঁছিলেন। রাশিয়ার উত্তর উপকূল ধরিয়া অথবা আমেরিকা ঘুরিয়া প্রাচ্যে যাওয়ার চেষ্টাও সুরু হইল। কিন্তু এ যুগের সেরা অভিযান—নাবিক ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলান স্পেন হইতে বাহির হন এবং তিন বৎসর

বিভিন্ন অভিযাত্রীর আবিষ্কার-পথ

পর আমেরিকার দক্ষিণ উপকূল, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন। ইহাতে হাতে-কলমে প্রমাণ হয় যে পৃথিবী গোল। ম্যাগেলানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ নাবিক ড্রেক বাহির হন বিশ্বপরিক্রমায়। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ লুট করিতে করিতে ড্রেকের 'গোল্ডেন হাইণ্ড' জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছায় এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া তিন বৎসর পর প্রায় আট লক্ষ পাউণ্ডের সোনারূপা লইয়া ইংল্যাণ্ডে ফেরে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দিলেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ-এশিয়ায় পর্তুগালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিয়াছিল হল্যাণ্ড। শীঘ্রই ওলন্দাজরা সিংহল ও মালাক্কা হইতে পর্তুগীজদের হটাইয়া দিল এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ও চীন-জাপানের বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া মশলার কারবার, দখল করিয়া লইল। মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজরা তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইল। আমেদাবাদ, সুরাট, মসুলীপত্তন, মাদ্রাজ, কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের ফ্যাক্টরী বা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হইল।

ফরাসীরা বেশ দেরীতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে মন দেয়। কার্টিয়ার ফরাসী-ক্যানাডা আবিষ্কার করেন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। স্যাঁপলা (Champlain) প্রভৃতি আবিষ্কারকের চেষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ক্যানাডা ও মিসিসিপি তীরে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও মাদাগাস্কারে ঘাঁটি তৈরী করিয়া তাহারা এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্ব-কালে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের পণ্ডিচেরী ও

চন্দননগরে কুঠি নির্মাণ করে। এইভাবে আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্য ও উপনিবেশের অধিকার লইয়া প্রতিযোগিতা সুরু হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের গুরুত্ব অসীম। দেশ-বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মানুষের চিন্তার পরিধি প্রসারিত করিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের ধারণা বদলাইয়া গেল। অর্থনৈতিক ফল আরও সুদূর-প্রসারী। আমেরিকা হইতে প্রচুর সোনারূপা আসিল। প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্যে প্রভূত লাভের ফলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িল এবং শিল্পের প্রসার সম্ভব হইল। যাহারা মূলধন যোগাইত, শেষ পর্যন্ত তাহারাই ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ধনতন্ত্র। কেনা-বেচা, লেন-দেন বাড়ায় পশ্চিম-ইউরোপে জিনিস-পত্রের দাম চড়িতে থাকে। কিন্তু কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকদের মজুরী সেই হারে বাড়ে না। লাভের হার বাড়ায় বণিক ও মহাজন শ্রেণী হঠাৎ বড়লোক হইল—জমিদার ও কৃষক-মজুর শ্রেণীর অবস্থা আরও খারাপ হইল। এই যুগেই ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করিল।

খ্রীষ্টাব্দ
- —১২৭২ চীন-দরবারে মার্কো পোলো
- —১৪৮৬ বার্থলোমিউ ডিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম
- —১৪৯২ কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার
- —১৪৯৭ ক্যাবটের আমেরিকায় অবতরণ
- —১৪৯৮ ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন
- —১৫১৯-২১ ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ
- —১৫৭৭-৭৯ ড্রেকের ভূ-প্রদক্ষিণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য

মুঘল যুগের বৈশিষ্ট্য—ইউরোপে যখন ধর্মবিপ্লব চলিতেছিল, ভারতবর্ষে তখন মুঘল আমল। তুর্ক-আফগান যুগের অরাজকতা দূর হইয়া আবার কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে দেশের ঐশ্বর্য বাড়িল। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমান সভ্যতার সমন্বয়ে শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হইল। ধর্মের ক্ষেত্রে পূর্বেই দেখা দিয়াছিল নানা সংস্কার-ধর্মী আন্দোলন। নানা দিক দিয়া মুঘল যুগ ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন—বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের কামানের সম্মুখে পাঠানের প্রাচীন রণকৌশল পরাভূত হয় ও স্থলতান ইব্রাহিম লোদী নিহত হন। দিল্লী ও আগ্রা সহজেই অধিকৃত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করিয়া বাবর সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেন। হিন্দুস্থানে রাজপুত-প্রাধান্য বিস্তারের আশা চিরতরে অস্তমিত হইল।

বাবরের পর রাজা হইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। আফগানরা তখন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে তৎপর হয়। ভ্রাতা কামরানকে পাঞ্জাব ছাড়িয়া দেওয়াতে হুমায়ুন দুর্বল হইয়া পড়েন। পিতার মত

ধৈর্য ও উৎসাহ লইয়া তিনি কোন লক্ষ্য অনুসরণ করিতে পারিতেন না। রাজ্যশাসন অপেক্ষা অধ্যয়নে এবং অহিফেন-সেবনে তিনি বেশী সুখ পাইতেন। আফগানদের হাত হইতে গুজরাট জয় করিলেও বাংলা-বিহারে শের শাহের সঙ্গে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করিয়া পারস্যে আশ্রয় লইতে হইল।

হস্তিপৃষ্ঠে বাবর

শের শাহ—শের শাহ ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিহারের এক পাঠান জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। চৌসা ও কনৌজে হুমায়ুনের সহিত তাঁহার প্রবল যুদ্ধ হয়। পরাজিত হুমায়ুন পলায়ন করিলে তিনি দিল্লী অধিকার করেন ও পরে মালব, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ এবং রাজপুতানার খানিকটা অধিকার করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেই তিনি আপনার অসাধারণ শাসন-প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সরকারে এবং সরকারগুলিকে পরগণায় বিভক্ত করেন। তিনি জমি জরীপের ব্যবস্থা করেন এবং উৎপন্ন শস্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে খাজনার হার নির্ধারণ করেন। প্রজার স্বত্ব পাট্টা ও কবুলিয়ত দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং তাহাদের শস্য

বা অর্থ দিয়া খাজনা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য শের শাহ রাস্তা-ঘাটের উন্নতি সাধন, ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা ও বহু বিরক্তিকর শুল্ক রহিত করেন। মুদ্রায় রৌপ্যের ভাগ কমাইয়া দিয়া দিল্লীর সুলতানগণ লাভ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। শের শাহের আমলে তাহা বন্ধ হয়। সুবিচারের জন্য আদালত স্থাপন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য পুলিসের ব্যবস্থা তাঁহার আর এক কীর্তি। মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। আকবরের শাসন ও ভূমি নীতি অনেকাংশে শের শাহের নিকট ঋণী। মতের এমন 'ঔদার্য ও সকল শ্রেণীর প্রজার জন্য এমন সহানুভূতি মধ্য যুগের ইতিহাসে বিরল।

আকবর—শের শাহের উত্তরাধিকারিগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইলে হুমায়ুন হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু দিল্লী অধিকার করিবার পর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আকবর হিন্দুস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, উত্তরভারত তখন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। দক্ষিণাপথের ছয়টি মুসলমান রাষ্ট্র—খান্দেশ, বেরার, বিদার, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এবং হিন্দু বিজয়নগর সাম্রাজ্য উত্তরাপথের রাজনীতিতে কোন অংশ গ্রহণ করিত না। পর্তুগীজরা গোয়া ও দিউ দখল করিয়া লইয়াছিল। তরবারির সাহায্য ব্যতীত মুঘল শাসন বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিবার কোন উপায় ছিল না।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আকবর রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি গড়িয়া তুলিলেন এক বিরাট সাম্রাজ্য। প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে আকবর বুঝিতে পারেন, রাজপুতের সাহায্য ছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষা অসম্ভব। তাহাদের উদার ব্যবহারে

তুষ্ট করিয়া রাজদরবারে ও সৈন্যবাহিনীতে বড় বড় পদ দিয়া, এমন কি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তিনি তাহাদের বশীভূত করেন। শেষ রক্তবিন্দু দিয়া মানসিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুত বীরগণ মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাজপুতের আনুগত্য ও শৌর্য বাদ দিয়া মুঘল সাম্রাজ্য কল্পনা করা যায় না। পূর্বে শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য ত ছিলই, উপরন্তু মুসলমান আমলে কর আদায় ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ টানা হইত। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর কর, হিন্দুদের উপর জিজ্রিয়া কর প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া আকবর উদার সমদর্শিতার পরিচয় দিলেন। আত্মসম্মান ফিরিয়া পাইয়া হিন্দু সমাজ আকবরের প্রতি কৃতজ্ঞ রহিল। আভ্যন্তরীণ বিপ্লব বা বিদ্রোহের ভয় থাকিল না।

আকবর

আকবরের চরিত্র—আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আকবরের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে মধ্যমাকৃতি হইলেও আকবরের শারীরিক শক্তি ছিল বিস্ময়কর। তাঁহার রং ময়লা হইলেও মুখশ্রীতে ছিল প্রখর বুদ্ধি ও দৃপ্ত আভিজাত্যের ছাপ। তাঁহার ব্যবহার ছিল অতি অমায়িক,

অশন-ব্যসনে ছিল সুরুচি ও সংযমের পরিচয়। সাম্রাজ্য জয় ও শাসনেই তাঁহার বিরাট প্রতিভা ব্যয়িত হয় নাই। ফতেপুর সিক্রির
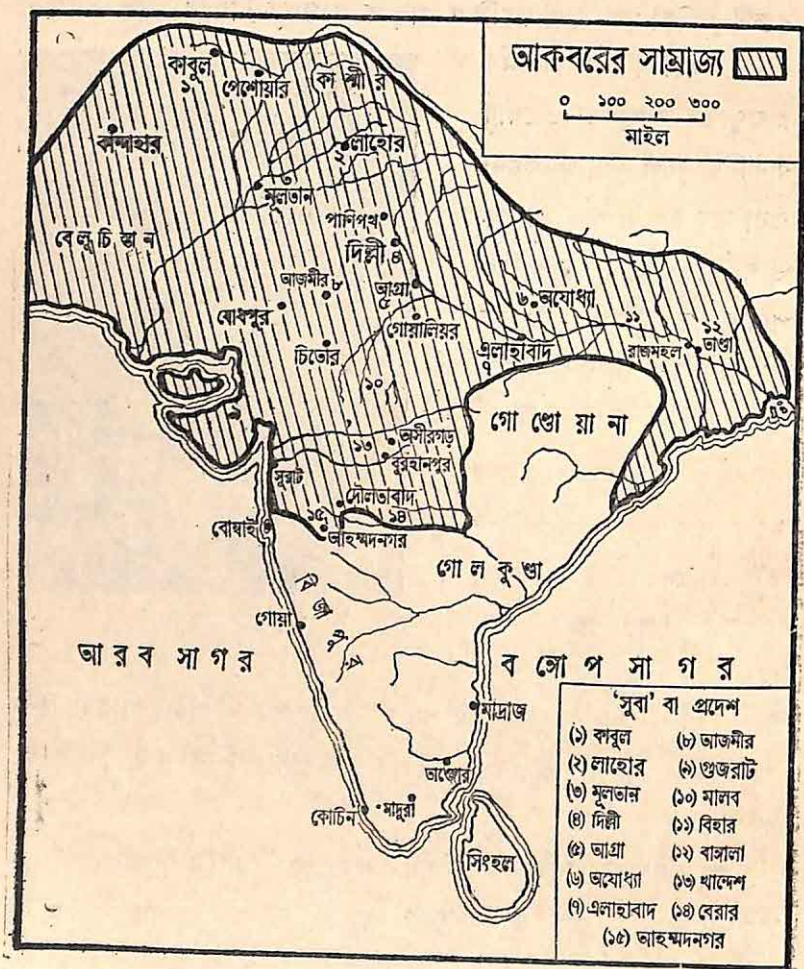
অপূর্ব স্থাপত্যে তাঁহার শিল্পজ্ঞানের সাক্ষ্য রহিয়াছে। নিরক্ষর হইলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য আহরণে তাঁহার নিরলস আগ্রহ ছিল।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তিনি ফার্সী ও তুর্কী সাহিত্য এবং বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব আয়ত্ত করেন। হস্তিযুদ্ধ, শিকার ও পোলো-খেলায় তিনি যেমন বীরোচিত আনন্দ পাইতেন, তেমনি আবুল ফজলের সহিত ইতিহাস আলোচনায় বা তানসেনের সহিত সঙ্গীত চর্চায়, তোড়রমলের সহিত রাজস্বনীতি নির্ধারণে বা বীরবলের সহিত রসালাপেও তাঁহার কম আগ্রহ ছিল না।

ধর্মের গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না। জীবনের প্রথমে সুফী মরমিয়াদের সংস্পর্শে আসিয়া এবং পরে হিন্দু বেগমদের সাহচর্যে ও হিন্দু, জৈন, খ্রীষ্টান ধর্মজ্ঞদের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে আকবর বুঝিয়াছিলেন—পারমার্থিক তত্ত্বে কোন বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া অধিকার নাই। আকবর তখন এক সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখিলেন, ভারতবর্ষের মত বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত রাষ্ট্রে এমন একটি ধর্ম স্থাপন করিতে চাহিলেন যাহার মূলনীতি হিন্দু-মুসলমান সকলেই গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যাহার ভিতর দিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'দীন ইলাহি' বা ভগবৎপন্থা প্রবর্তন করিলেন। এই ব্যাপারে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রবল ছিল না, আকবরের সত্যানুসন্ধিৎসু মন ও আধ্যাত্মিক প্রেরণাও ছিল। তাঁহার মূলনীতি ছিল 'সূল-ই-কূল' বা পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য শান্তি, প্রত্যেকের সহিত মৈত্রী। এমন উদার ধর্মমত তদানীন্তন কালে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু আপনার মতবাদ জোর করিয়া আকবর কাহারও উপর চাপান

।

জাহাঙ্গীর—আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের চরিত্র কোমলতা ও নিষ্ঠুরতার, ন্যায়পরায়ণতা ও যথেচ্ছাচারের, সূক্ষ্ম রুচি ও স্থূল প্রবৃত্তির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। অমিত মদ্যপান ও অহিফেন সেবনে তাঁহার

সুগঠিত স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। পত্নী নূরজাহানের হস্তে তিনি ক্রীড়নকের মত চলিতেন। অথচ সাহিত্যে ছিল তাঁহার গভীর অনুরাগ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হইতেন, শিল্পের ছিলেন তিনি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

জাহাঙ্গীর

তাঁহার রচনা-শক্তির প্রমাণ রহিয়াছে আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাঁহাগিরি'তে।

মেবার জয় ও কাংড়া অধিকার জাহাঙ্গীরের সময় হইয়াছিল। কিন্তু আকবরের মত সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র খুস্‌রুকে সাহায্য করিবার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে হত্যা করিয়া, গুজরাটে জৈন মন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। অথচ ইসলামে

তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল না। জেসুইট পাদরী ও মোল্লাদের মধ্যে তর্ক বাধাইয়া দিয়া তিনি মজা দেখিতেন। তাঁহার আমলে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক চেষ্টা করে ও ইংরাজদের আগমন হয়।

শাজাহান—সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃরক্তে স্নান করিলেও
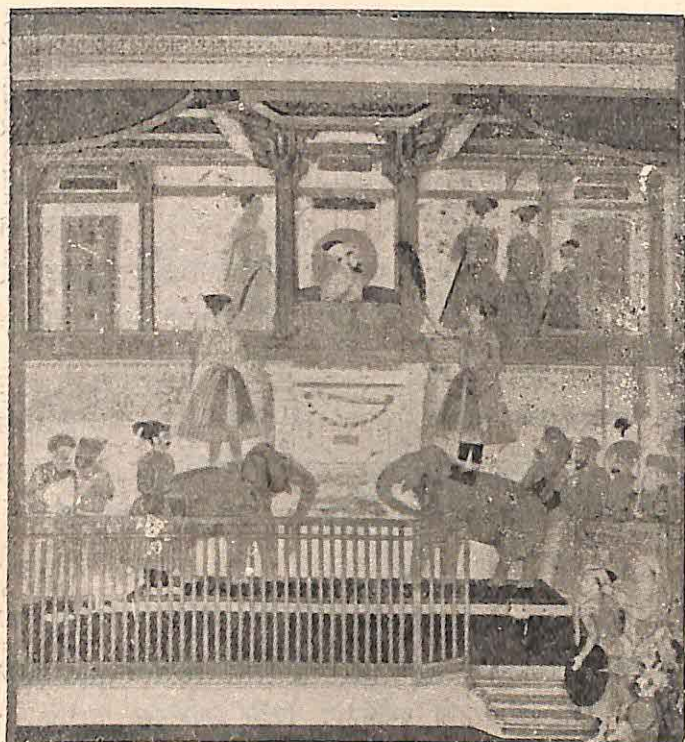
সিংহাসনে শাজাহান

জাহাঙ্গীরের পুত্র শাজাহান সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য

প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুজরাটের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার অন্নাভাব মোচনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। কান্দাহার জয় করিবার জন্য তিন তিন বার তিনি অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক বারই তাহা বিফল হয়। বল্‌খ্ ও বদখ্‌শান জয় করিতে গিয়া মুঘলবাহিনী পুনরায় পর্যুদস্ত হয়; ইহাতে প্রচুর অর্থ নষ্ট হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি খানিকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। আহম্মদনগরের পতন হয়, গোলকুণ্ডা বশ্যতা স্বীকার করে ও বিজাপুরের সহিত সন্ধি হয়।

শাজাহানের আমলকে মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা চলে। তখন আভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঐশ্বর্যের ছটায়, আড়ম্বরের ঘটায় মুঘল সাম্রাজ্যের তুলনা ছিল না। শাজাহান পিতার মত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কবি-দৃষ্টি ও বিদগ্ধ রুচির সাক্ষ্য দিতেছে দিল্লী ও আগ্রার অনুপম হর্ম্যরাজি।

আওরঙজেব—আওরঙজেবের না ছিল পিতার মত শিল্পানুরাগ, না ছিল প্রপিতামহের সমদর্শিতা। ক্ষান্তিহীন রাজ্যবিস্তারের ভিতর দিয়া তিনি আপন অহমিকাকে চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন মেকিয়াভেলির আদর্শ রাজা; উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভ্রাতৃহত্যা, বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি হীনতার আশ্রয় লইতে তাঁহার বাধে নাই। অথচ আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রায়, ব্যক্তিগত বীরত্বে, সাহসে ও কঠোর ধর্মনিষ্ঠায় তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার উদ্যম ও শ্রমশক্তির একমাত্র তুলনা আকবর। কূটনীতি ও রণনীতিতে তাঁহার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। কিন্তু সকল গুণ ব্যর্থ হইল ধর্মান্ধতার দোষে। গোঁড়া সুন্নি আওরঙজেব ভিন্ন সম্প্রদায়ের

ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্য
০ ১০০ ২০০ ৩০০
মাইল
কাবুল
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
জয়পুর
আগ্রা
যোধপুর
চিতোর
এলাহাবাদ
পাটনা
গৌহাটি
ঢাকা
আহমদাবাদ
দৌলতাবাদ
বোম্বাই
রায়গড়
সাতারা
গোয়া
ব ঙ্গো প সা গ র
আ র ব সা গ র
তাঞ্জোর
মাদুরা
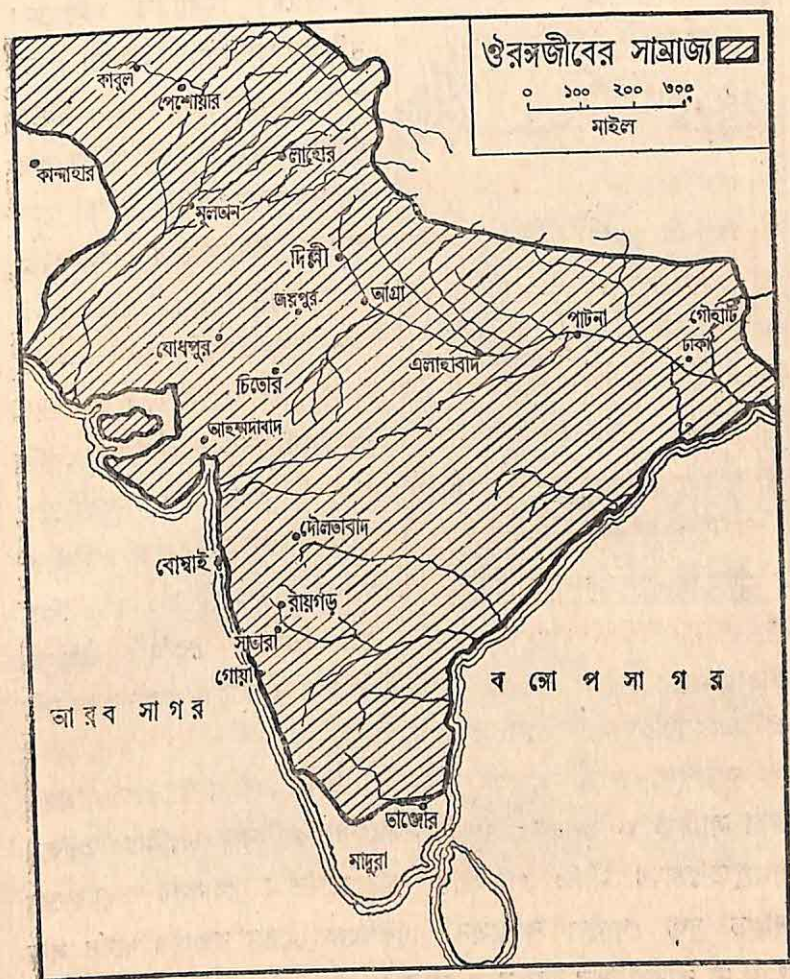
অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না। হিন্দু ও শিয়া তাঁহার হস্তে নির্বিচারে নির্যাতিত হইয়াছে। মন্দির ভাঙ্গিয়া, জিজিয়া কর বসাইয়া, হিন্দুদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া ও অধিক শুল্ক দিতে বাধ্য করিয়া তিনি তাহাদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালাইলেন। ভোগকে তিনি মনে করিতেন পাপ। অতি সরল ছিল তাঁহার জীবনযাত্রা। কোরাণে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের করণীয় আচার-পালনে বিরত হইতেন না। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানে কোন ঔৎসুক্য তাঁহার জাগে নাই। তাঁহার রসহীন কঠোর জীবনে আকবরের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র বর্ণাঢ্যতা ছিল না।

আওরঙজেব

রাজপুত, জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ, মারাঠা বিদ্রোহের ভিতর দিয়া লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল। রাজপুত-তোষণ নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিনি যোধপুর ও মেবারের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখগুরু তেগ বাহাদুর ধর্মের সার ত্যাগ না করিয়া শির দিলেন। তারপর মহারাষ্ট্রের গিরি-দরী প্রকম্পিত করিয়া শিবাজীর জয়ধ্বনি উঠিল, দুর্গে দুর্গে উড়িল শিবাজীর পতাকা। ছলে বলে কৌশলে আওরঙজেব তাঁহাকে দমন করিতে পারিলেন না,

বরং কূটবুদ্ধির প্রতিযোগিতায় ও প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার পরাজিত হইলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ আওরঙজেবের হাতে আসে। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডাও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

শিবাজী

হয়। কিন্তু পঁচিশ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে প্রভূত অর্থ ও লোকক্ষয় হয়। উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা

দিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর আহম্মদনগরে শ্রান্ত আওরঙজেব ভয়াবহ ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য এবার বালুকারচিত সৌধের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকবর হিন্দুদের সমর্থন পাইতেন, রাজপুতদের সহযোগিতা তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। আওরঙজেবের ধর্মান্ধতা হিন্দুদিগকে বিদ্রোহী করিল, রাজপুতদিগকে সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত করিল। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মিলনভূমি ভারতবর্ষে অনুদার পরধর্মদ্বেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়ী হইল না।

আওরঙজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ব্যতীত অন্যান্য কারণও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী। দেখিতে বিপুল হইলেও মুঘল বাহিনীর বহু দুর্বলতা ছিল। মনসবের আয় ভোগ করিলেও অনেক মনসবদার নিয়ম মত সৈন্য ও অশ্ব রাখিত না। যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল না। শাসক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল না। নৌ-বাহিনী গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা মুঘল সম্রাটগণ উপলব্ধি করেন নাই।

বাহ্যিক আড়ম্বরের ছড়াছড়ি চলিলেও মুঘল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। আমীর-ওমরাহদের মৃত্যুর পর তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত বলিয়া কেহ সঞ্চয় করিত না, ভোগবিলাসেই সমগ্র আয় ব্যয় করিত। সঞ্চয় ব্যতীত মূলধন জমে না, আর মূলধনের অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ফলে যেটুকু অর্থ ভারতে আসিত তাহাতে জীবনযাত্রার মান বাড়িল না, বরং জায়গীরদারের অত্যাচারে এবং নানা করভারে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইল। সকলকে বঞ্চিত করিয়া সম্রাট ও উচ্চ-পদস্থ ওমরাহগণ যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা ব্যয়িত হইত যুদ্ধে,
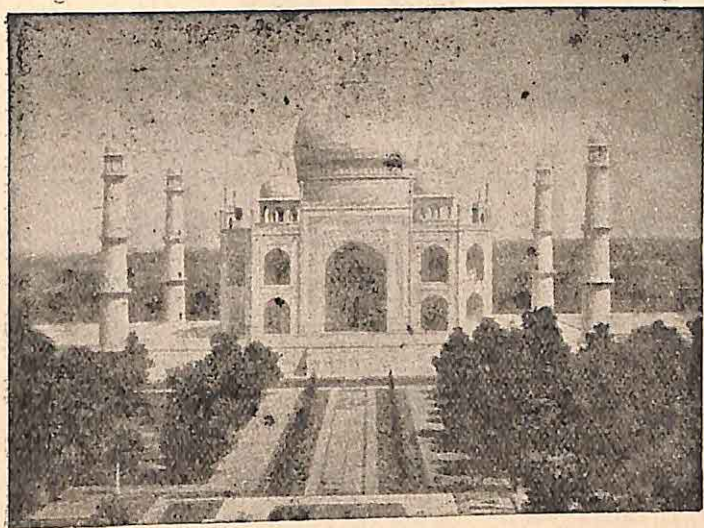
তাজমহল
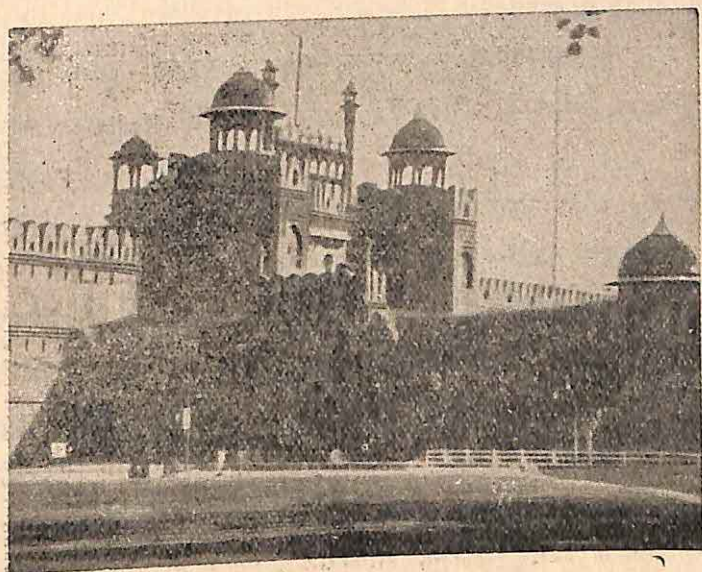
দিল্লী দুর্গ (একাংশ)

বিলাস-ব্যসনে, বা সমাধি-মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতির অলঙ্করণে।

কেন্দ্রীয় শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণে তাহাও লুপ্ত হয়। আওরঙজেবের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন এবং বহু নরনারী হত্যা করেন। তারপর তাঁহার সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালি বারবার ভারত আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করেন। বৈদেশিক আক্রমণকারীর গতিরোধ করিতে না পারায় মুঘল সম্রাটের মর্যাদা ও প্রভুত্ব ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। মারাঠা, শিখ, রাজপুত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়েন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থা ও তাহার স্থায়ী প্রভাব—মুঘল সাম্রাজ্য না টিকিলেও মুঘল শাসন-ব্যবস্থা পরবর্তী কালের ইংরাজদের শাসন-ব্যবস্থা বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই আজকের ভারতশাসন ব্যাপারেও মুঘল ব্যবস্থার ছাপ খুবই স্পষ্ট। আকবর ভারতকে কয়েকটি সুবায়, সুবাকে সরকারে, সরকারকে পরগণায় বিভক্ত করেন এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইংরাজরাও তাহাই করিয়াছিল। ইংরাজ সরকারের রাজস্ব বিভাগও তোড়রমলের আদর্শ অনেকখানি অনুকরণ করিয়াছিল। জমি জরীপের ব্যবস্থা; উৎপাদন শক্তি, শস্যের প্রকৃতি ও গড় উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে খাজনা নির্ধারণ; রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত; রায়তের অধিকার ও রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য মকদ্দম, পাটওয়ারী, কানুনগো প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ—সবই মুঘলদের রীতির অনুকরণ। ইংরাজরা বিচার ও পুলিশ

বিভাগের কাজে মুঘলদের কোতোয়াল ও ফৌজদারের অনুরূপ কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিল।

তবে মুঘল ও ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। মুঘল সরকার প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য সচেতন ভাবে কোন দিনই ভাবে নাই এবং শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জলসেচ প্রভৃতি জাতিগঠন-মূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। মুঘল রাষ্ট্র ছিল স্বৈরতন্ত্র, জনগণের মত লইয়া তাহাকে চলিতে হইত না। দূর-দূরান্তের প্রদেশগুলি আয়ত্তে রাখার জন্য সম্রাট নানা কৌশলের আশ্রয় লইতেন, যেমন সুবাদারের কার্যের উপর দেওয়ান নজর রাখিত। দেওয়ানকে দেওয়া হইয়াছিল রাজস্বের ভার, সুবাদারকে শাসন ও সৈন্য বিভাগের কর্তৃত্ব। গ্রামগুলি ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী আত্মনির্ভর। রাজদরবারে চাকুরী নিতে গেলেই সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিতে হইত এবং চাকুরীর মাহিনা অনুসারে পদ জুটিত। দুর্নীতি দমনের জন্য নিযুক্ত মুতাসিব আরেকটি অভিনব মুঘল প্রতিষ্ঠান।

হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়—মুঘল সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সংগীতে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে, পরস্পরের সহযোগিতা করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রির যোধাবাঈ মহলে ও দেওয়ান-ই-খাসে, আগ্রা দুর্গের জাহাঙ্গীরী মহলে এবং সেকেন্দ্রায় হিন্দু অলঙ্করণ, হিন্দু পদ্ধতিতে তৈরী থাম ও ছাদ দেখা যায়। তাজমহলের তুলনা ত কোথাও মেলে না। যমুনাতীরে শাজাহানের প্রিয়তমা বেগম মমতাজের এই শুভ্র সুন্দর মর্মর স্মৃতিমন্দির ভারতবর্ষের গর্ব ও পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু। ভারতীয় ও পারসিক রীতির সংমিশ্রণে ইহা নির্মিত। দিল্লী
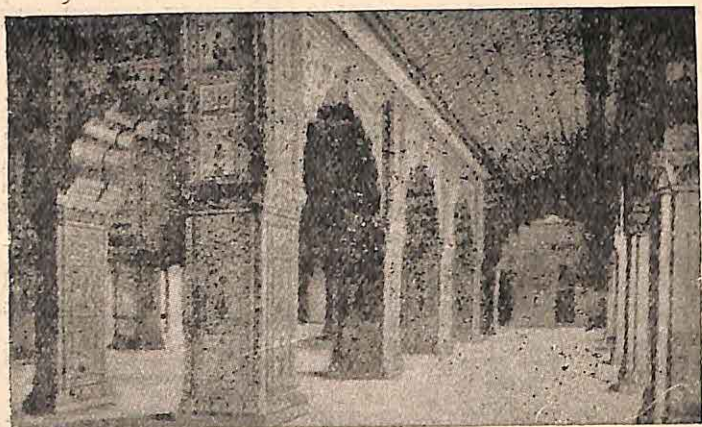
দেওয়ান-ই-খাস (একাংশ)
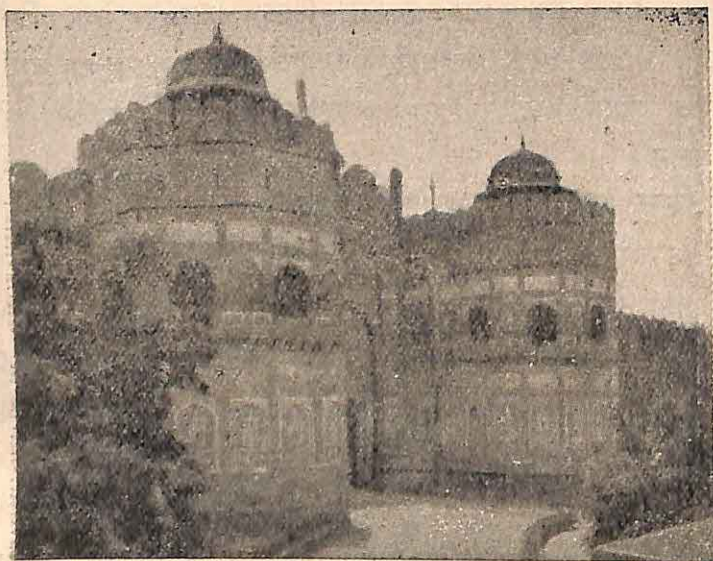
আগ্রা দুর্গ (একাংশ)

দুর্গ ও জামা মসজিদ শাজাহানের আমলের আর দুটি সার্থক সৃষ্টি। চিত্রশিল্পে হিন্দু ও মুসলমান হাত লাগাইয়াছে। মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ, কেশব ও যশোবন আকবরের আমলের চিত্রকর। জাহাঙ্গীরের দরবারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন মনসুর, বিশন দাস ও মনোহর। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মিঞা তানসেন ভারতীয় ও পারসিক রাগ মিশাইয়া ইমনের সৃষ্টি করেন। তাঁহার গলায় মল্লার, সাহানা প্রভৃতি রাগ-রাগিণী অনবদ্য রূপ পাইল। সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্র এই সময়ে নির্মিত হয়।
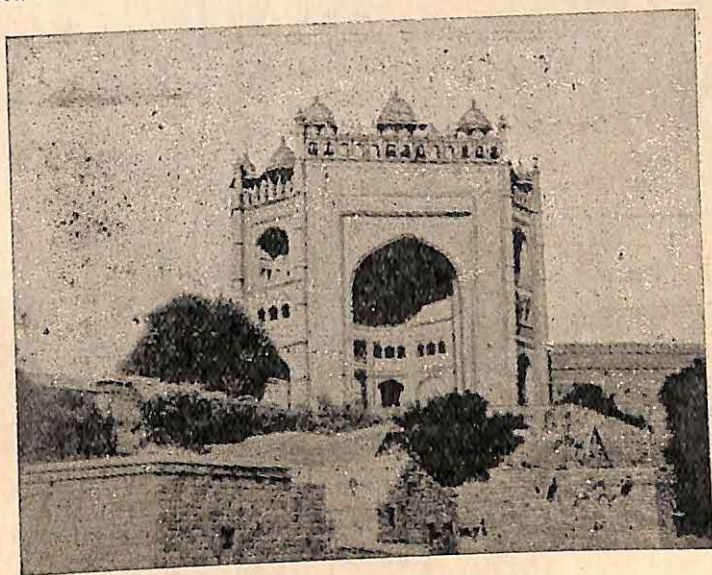
বুলন্দ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রি)

সাহিত্যে এবং ধর্মে এই সমন্বয়ের সূত্রপাত মুঘল আমলের আগেই হইয়াছিল। সুফী মরমিয়াবাদের প্রভাবে ভক্তিরসের প্লাবন বহিয়া যায়। তাহাতে ভাসিয়া গেল জাতির পাঁতি, আচারের

আতিশয্য ও তত্ত্বের কূটতর্ক। বেদ ও কোরাণ, হিন্দু ও মুসলমানের ভেদাভেদ ভুলিয়া কবীর, দাদূ, রজ্জব ও মীরা আকুল হৃদয়ের প্রেম
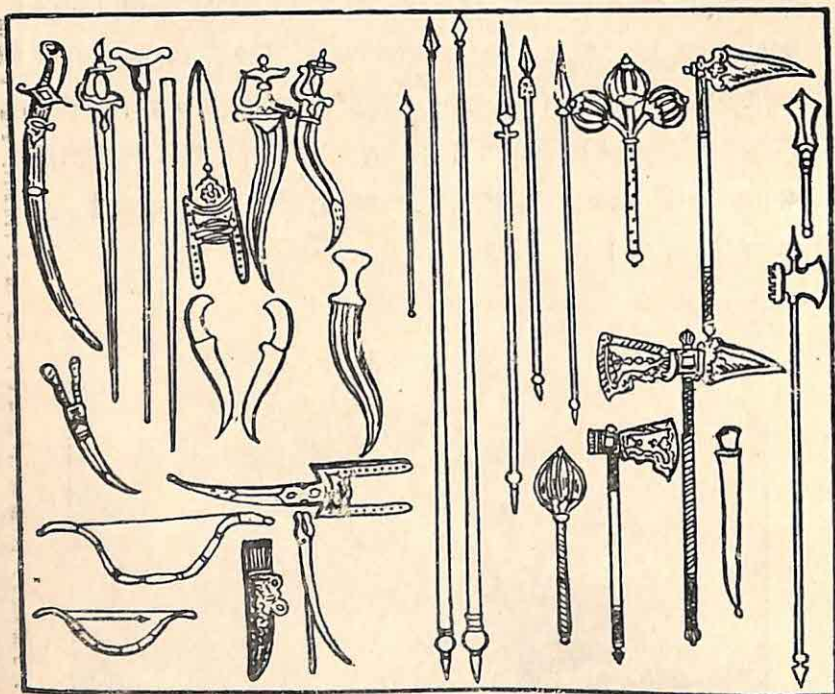
মুঘল আমলের অস্ত্রশস্ত্র

দিয়া ঈশ্বরকে পাইতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীচৈতন্য দিলেন যবন হরিদাসকে কোল। তাঁহার হরিনাম-সংকীর্তনের আসরে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই স্থান হইল। এ যুগের প্রাদেশিক সাহিত্য বিষ্ণু বা রামের প্রতি ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুরদাসের সুরসাগর, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের পদাবলী, চৈতন্যদেব ও বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী, মীরার ভজন—রসের গভীরতায়
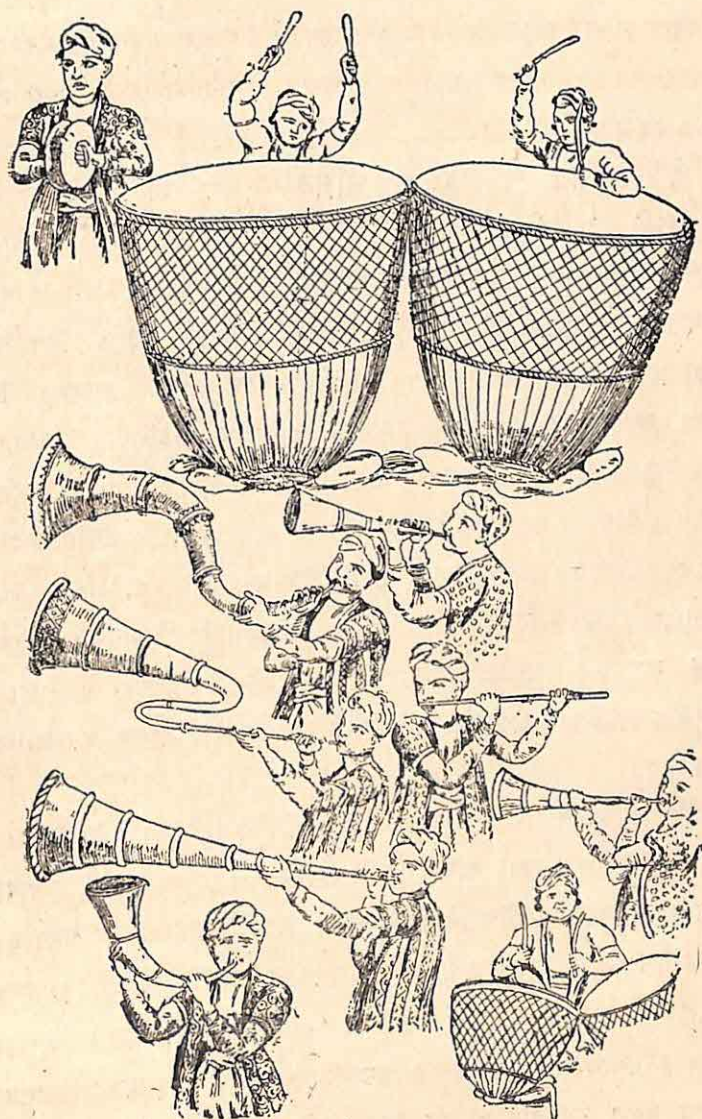
মুঘল যুগের বাদ্যযন্ত্র

ও সুরের মাধুর্যে অতুলনীয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমসাময়িক বাংলার সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারত এই সময় রচিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিক—মুঘল আমলে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকগণ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন দেশের বণিক-সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জাভা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের দিকে নজর দেয়। ইংল্যাণ্ড-রাজ প্রথম জেমসের চিঠি লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স্। তিনি ইংরাজ কোম্পানীর জন্য নানা সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংরাজ-রাজের প্রতিনিধি রূপে আগ্রা পেঁাছেন। তিনি তিন বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুরোহিত টেরীর রোজনামচায় জাহাঙ্গীরের দরবার সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়।

ইংরাজ কোম্পানী ভারতের কয়েকটি স্থানে কুঠি তৈরী করার অনুমতি পাইল এবং প্রথম কুঠি করিল সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ ও বরোচে; পরে মসুলীপত্তন, মাদ্রাজ, বালেশ্বর, পাটনা, কাশিমবাজার ও ঢাকায়। শাজাহান পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী অধিকার ও লুণ্ঠন করিলে বাংলায় ইংরাজদের ব্যবসায় বৃদ্ধির সুবিধা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে শুল্ক লইয়া আওরঙজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। চট্টগ্রাম দখল করিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহারা মাদ্রাজে পালায়। পথে বাংলাদেশে কোম্পানীর প্রতিনিধি জব চার্নকের দৃষ্টি পড়ে

গঙ্গার পূর্ববর্তী তিনটি গ্রামের উপর। তাহাদের নাম সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা। মুঘল সরকারের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে কোম্পানীর বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহাই ভবিষ্যৎ কলিকাতা মহানগরীর সূচনা।

ইউরোপীয় বণিকের অভ্যাগমে ভারতের বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত নীল, নানারূপ কার্পাসবস্ত্র, সোরা, রেশম ও চিনি। নগদ সোনা-রূপা দিয়াই এসব পণ্য কেনা হইত, কারণ ইউরোপীয় দ্রব্যের বিশেষ চাহিদা এদেশে তখন ছিল না। তবে বিভিন্ন ধরণের ঘড়ি, ছবি, আয়না, পশমের কাপড়, গন্ধদ্রব্য, চীনামাটির পাত্র, ও কাঁসা, লোহা, টিন প্রভৃতি ধাতু আমদানি হইত। রাজদরবারে নানা টুকিটাকি মজার জিনিসের খুব কদর ছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকের চোখে ভারত—রো, বার্নিয়ার, ট্যাভার্নিয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটকের বৃত্তান্ত, ইউরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিগুলির কাগজপত্র, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবর-নামা' এবং প্রাদেশিক সাহিত্যে এ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা উপাদান মেলে। মুঘল সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। দিল্লীশ্বরের তুলনা হইত জগদীশ্বরের সঙ্গে। তার পর তাঁর অভিজাত আমীর ওমরাহ। ইহাদের ভাগ্যেই সমস্ত সুখ-সুবিধা ও সম্মান জুটিত। মুঘল দরবারের জাঁকজমক ছিল প্রবাদের বিষয়। অভিজাত শ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্য সম্রাটের অনুকরণে ভোগবিলাসে ও সম্রাটকে নজর দিতে ব্যয়িত হইত। নজরের বদলে সম্রাট বর্ষণ করিতেন খেতাব, খেলাত ও মনসব। সোনা-রূপার জরী দেওয়া রেশম ও কিংখাবের খেলাতী পোষাক তৈরী করিতে রাজকীয় কারখানাগুলি দিনরাত্রি খাটিত। জুয়া

খেলার রেওয়াজ ছিল। সামান্য উৎসবেও খাদ্য এবং সুরার স্রোত বহিত। বোখারা হইতে আনা হইত টাটকা মেওয়া। দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল অনেক। এই অমিতব্যয়ের চাহিদা মিটাইতে ওমরাহরা ক্রমশঃ ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছিল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে প্রজা শোষণ করিতেছিল।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার বাংলার বস্ত্র ও রেশম শিল্পের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। ওলন্দাজ পর্যটক ট্যাভার্নিয়ারের মতে বাংলা দেশে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড রেশম তৈরী হইত এবং ইহার অর্ধেকের বেশী বিদেশে রপ্তানি হইত। বস্ত্র যে কত প্রকারের উৎপন্ন হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়িয়াছিল মনে হয় না। অবশ্য লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে কেহ টাকার কথা প্রকাশ করিত না।

ওলন্দাজ পেলসেয়ার্টের মতে মজুর ও কারুশিল্পীর জীবনযাত্রার মান ছিল খুব নীচু। তাহারা থাকিত কুঁড়ে ঘরে, পরিত সাধারণ কাপড়, এক বেলা খাইত খিচুড়ি, দুর্ভিক্ষের সময় মারা পড়িত দলে দলে। তবে আকবরের আমলে অবস্থা এত খারাপ ছিল না। শেষে অনেক সময় তাহাদের বেগার খাটান হইত। কৃষকদের অবস্থা প্রায় তদ্রূপ ছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেকের বেশী খাজানা দিয়া যেটুকু বাকী থাকিত জায়গীরদার বা কোন রাজকর্মচারী তাহা অনেক সময় কাড়িয়া লইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন—আকবরের সময় মণ-পিছু গমের দর ছিল ১২ 'দাম', ভাল চাল—১২০ 'দাম', খারাপ চাল—২০ 'দাম', ঘি—১০৫ 'দাম', তেল—৮০ 'দাম', দুধ—২৫ 'দাম'। সায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলার জিনিসপত্রের দাম আরও কমে। কিন্তু শ্রমিকদের গড়পড়তা দৈনিক আয়ের হার ছিল ২ হইতে ৭ 'দাম'। জিনিসের

মূল্য কমায় তাহাদের কোন সুবিধা হয় নাই। দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তরালে এই অন্ধকারের প্রতি বার বার অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল।

ভারত ও বহির্জগৎ—মুঘল আমলে ভারতের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির যোগাযোগ রক্ষা করিত পাশ্চাত্ত্য বণিকগণ এবং ভ্রমণকারিগণ। কিন্তু পারস্য, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ কেবলমাত্র রাজনৈতিক কূটকৌশলে ও সামরিক অভিযানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাণিজ্য ও সংস্কৃতির যোগসূত্র অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। এশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মুঘল ভারতের ঐশ্বর্য ও শক্তির যথেষ্ট সম্মান ছিল।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ: মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন
—১৫৩০ বাবরের মৃত্যু
—১৫৫৬ আকবরের রাজ্যলাভ
—১৫৮২ 'দীন ইলাহি'র প্রবর্তন
—১৬০০ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ লাভ
—১৬০৫ আকবরের মৃত্যু
—১৬০৯ হকিন্সের আগমন
—১৬১৫-১৮ টমাস রো'র দৌত্য
—১৬২৭ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু
—১৬৩০ শিবাজীর জন্ম
—১৬৫৮ আওরঙজেবের সিংহাসনলাভ
—১৬৭৫ তেগবাহাদুরের শিরচ্ছেদ
—১৬৮০ শিবাজীর মৃত্যু
—১৭০৭ আওরঙজেবের মৃত্যু
—১৭৩৯ নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ বিপ্লব

পিউরিটান বিপ্লবের তাৎপর্য—ষোড়শ শতাব্দীতে টিউডর রাজবংশের আমলে ইংল্যাণ্ডে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিতেছিল। প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে রেনেসাঁস, ধর্মবিপ্লব ও ব্যবসাবাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সামন্ত প্রভুরা ছিল সমাজের নেতা। বণিক, ব্যবহারজীবী ও ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সেই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনার আংশিক অধিকার আদায় করে। ইতিহাসে সেই সংগ্রাম পিউরিটান বিপ্লব বা ইংরাজ বিপ্লব নামে অভিহিত।

টিউডর স্বৈরতন্ত্র—টিউডর বংশীয় রাজা ও রাণীরা যে শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তাহা ছিল প্রথমে এসব পরিবর্তনের সহায়ক। সামন্তকুলের স্বার্থ শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও অর্থনৈতিক প্রগতির বিরোধী ছিল। টিউডর রাজগণ কতককে প্রাণদণ্ড দিলেন, 'স্টার চেম্বার' নামক রাজকীয় আদালতে কঠোর বিচার করিয়া ও সশস্ত্র অনুচর রাখা বে-আইনী করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সামন্তের শক্তি খর্ব করিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব হাতে আনিলেন, সামন্ত দলপতিদের মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত করিয়া নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত

করিলেন। পার্লামেণ্টে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। টিউডর রাজারা পার্লামেন্টকে আপন স্বার্থ সিদ্ধির উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং আনুগত্যের মূল্য স্বরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিলেন। পশমের ব্যবসায় যাহাতে বাড়ে এবং উপনিবেশ আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্যের প্রসার হয় সেদিকে তাঁহাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত বিরোধ—যতদিন স্পেনের নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কা ছিল ও পোপ জোর করিয়া ইংল্যাণ্ডের উপর ক্যাথলিক ধর্ম চাপাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ততদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণী টিউডর স্বৈরতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু স্পেনের নৌবহর পরাজিত হইলে দেশ নিরাপদ হওয়াতে তাহারা আপন অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এবং ধর্ম-সংস্কারের ব্যাপারে রাণীর রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে তাহারা আপত্তি জানায়। এলিজাবেথ তাঁহার প্রিয়পাত্রদের একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার দিতেন। তাহাও অনেকের বিরক্তির কারণ হয়। তিনি অতি কৌশলে এ বিরোধ বাড়িতে দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী স্টুয়ার্ট রাজগণ একে বিদেশী ছিলেন, তদুপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। অতএব রাজা ও পার্লামেণ্টের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

পার্লামেণ্টের সহিত জেম্‌সের বিরোধের কারণ—প্রথম জেম্‌সের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, কিন্তু তিনি ছিলেন অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং দাম্ভিক; তাঁহার বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করিতেন—প্রজাশাসনের বিধিদত্ত অধিকার

লইয়া রাজা পৃথিবীতে আসেন, তিনি ভগবানের প্রতিভূ এবং কেবল তাঁহারই নিকট কৃতকর্মের জন্য দায়ী। রাজার কার্যকলাপ সমালোচনা করিবার অধিকার প্রজাদের বা তাহাদের প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের নাই। পুরোহিতনেতা বিশপদের তিনি রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক অঙ্গ মনে করিতেন, বলিতেন বিশপ না থাকিলে এবং যাজকদের মধ্যে পদমর্যাদার তারতম্য না থাকিলে রাজাও থাকিবে না, অর্থাৎ রাজার অপ্রতিহত প্রভাব টিকিবে না। ইহা পিউরিটান-পন্থীদের মনঃপূত হয় নাই। জেম্‌সের মতে 'কমন ল' অর্থাৎ বহুদিনের প্রচলিত বিধিবিধান রাজা প্রয়োজন মত উপেক্ষা করিতে পারেন, অথচ পার্লামেণ্টের মতে রাজার প্রত্যেকটি কাজ আইনসঙ্গত হওয়া উচিত।

পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়াই তিনি ন্যায্য করের বেশী দাবী করিতে লাগিলেন, বহু জিনিসের উপর আমদানি শুল্ক বাড়াইয়া দিলেন। উৎকোচ গ্রহণ বা অপদার্থতার অপরাধে লর্ড্‌স্‌ সভার সম্মুখে রাজার মন্ত্রীদের বিচার করার ক্ষমতা (Impeachment) পার্লামেণ্ট দাবী করে। ইহাতে জেম্‌স্‌ ক্ষুণ্ণ হন। রাজকুমার চার্ল্‌সের সহিত ক্যাথলিক স্পেনের রাজকুমারীর বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মনোমালিন্য চরমে উঠে।

চার্ল্‌সের চরিত্র—পার্লামেণ্টের সহিত বিরোধ— জেম্‌সের পুত্র প্রথম চার্ল্‌সের নানা সৎগুণ ছিল। স্বভাবে অমায়িক, স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি স্নেহশীল, সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ভক্ত চার্ল্‌স্‌ কঠিন পরিশ্রম স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার কোন কল্পনাশক্তি ছিল না। তাঁহাকে বিশ্বাস করা চলিত না। একই সঙ্গে তিনি তিন-চারটি পরস্পর-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। তিনিও পিতার মত পার্লামেণ্টের অমতে কর আদায় করিতেন। তাঁহার

অবশ্য অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয় আগেকার অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়াছিল, তাছাড়া ইউরোপে চলিতেছিল ত্রিংশবর্ষব্যাপী ধর্ম-যুদ্ধ। চার্ল্‌স্ কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া জোর করিয়া ধনীদের নিকট হইতে ঋণ আদায় করিতে লাগিলেন। পাঁচজন ভদ্রলোক ইহা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদের বিনা-বিচারে আটক করা হইল। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ উঠিল—বিনা-বিচারে আটক রাখা বে-আইনী। পার্লামেণ্ট ইতিমধ্যে চার্ল্‌সের প্রিয় মন্ত্রী বাকিংহামকে বিচারের জন্য অভিযুক্ত

প্রথম চার্ল্‌স্

করিয়াছিল। এখন তাহারা স্যার জন ইলিয়টের নেতৃত্বে সমস্ত অভিযোগ বর্ণনা করিয়া এক অধিকারের আবেদন (Petition of Right) প্রস্তুত করিল। ঋণ বা কর পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত লওয়া চলিবে না, বিনা বিচারে লোককে আটক রাখা চলিবে না, জোর করিয়া কোন প্রজার বাড়ীতে সৈন্যদের থাকিবার ব্যবস্থা করা চলিবে না এবং শান্তির সময় সামরিক আইন জারী করা চলিবে না—এই ছিল আবেদনের প্রতিপাদ্য। বিষম রাগিয়া চার্ল্‌স্ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

ইহার পর এগার বৎসর স্ট্যাফোর্ড ও লডের সহযোগিতায় তিনি বিনা পার্লামেণ্টে রাজ্য শাসন করেন। পিউরিটানদের কঠোর শাস্তি দেওয়া

হইল। সমুদ্রের উপকূলবর্তী সহরগুলি যুদ্ধের সময় জাহাজ তৈরীর জন্য Ship-money নামক কর দিত। শান্তির সময় এবং সমগ্র দেশের উপর চার্ল্‌স্ সেই কর ধার্য করিলেন। এই সব কারণে শীঘ্রই তিনি জনসাধারণের অপ্রিয় হইলেন। জন হ্যাম্প্‌ডেন এই কর দিতে অস্বীকার করিয়া কারারুদ্ধ হইলেন। লডের ক্যাথলিক-ঘেঁষা ধর্ম-সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্যাল্‌ভিন-পন্থী স্কটল্যাণ্ডে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

দীর্ঘ পার্লামেণ্ট—অর্থাভাবে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে চার্ল্‌স্ পার্লামেণ্ট আবার ডাকিতে বাধ্য হইলেন। সভ্যরা দাবী করিল—অন্ততঃ তিন বৎসর অন্তর পার্লামেণ্ট ডাকিতেই হইবে, 'স্টার চেম্বার' প্রমুখ রাজার হাতে-ধরা বিচারালয় ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, 'শিপ-মানি' প্রভৃতি টাকা আদায়ের ফন্দি বে-আইনী এবং কোন করই পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত স্থাপন করা চলিবে না। স্ট্যাফোর্ডের প্রাণদণ্ড হইল, 'গ্র্যাণ্ড রিমন্‌স্ট্র্যান্‌স্' (Grand Remonstrance) নামক এক আবেদন-পত্রে শাসন-সংস্কারের একটা খসড়া দেওয়া হইল। চার্ল্‌স্ স্বয়ং পার্লামেণ্টে আসিলেন এই আবেদন-পত্রের রচয়িতাদের গ্রেফ্‌তার করিতে। ইহার পর গৃহযুদ্ধ ব্যতীত উপায় রহিল না।

ক্রম্ওয়েল—প্রধানতঃ অলিভার ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বগুণে পার্লামেণ্টপক্ষ রাজপক্ষকে পরাজিত করে। ক্রম্‌ওয়েলের জন্ম হয় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য হন। ৪৩ বৎসর বয়সে সুরু হয় তাঁহার সামরিক জীবন। ধর্মে ছিল তাঁহার গভীর বিশ্বাস। তিনি মনে করিতেন তাঁহার সব কিছু কার্য ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, অথচ তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল অতি প্রখর। ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া গৃহযুদ্ধের সময় নূতন সৈন্যবাহিনী (New Model Army) গঠনে বা পরিচালনে তিনি অবহেলা করেন নাই। তাঁহার

জ্বলন্ত আদর্শবাদে সৈন্যবাহিনী অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে অবশ্য তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না, কিন্তু তিনি গোঁড়া পিউরিটান ছিলেন না এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার ও পরমত-সহিষ্ণু। পরে দেশের শাসক হইয়া অসৎ আমোদ-প্রমোদ দমন করিলেও, তিনি সকল প্রকার আনন্দ উৎসবের বিরোধী ছিলেন না। সঙ্গীত ও কাব্য তিনি ভালবাসিতেন, রাজকীয় সংগ্রহশালার অনেক ছবি তিনি বিক্রয় হইতে দেন নাই। গৃহযুদ্ধের পর রাজ্যশাসনের সময় তাঁহার বৈদেশিক নীতি তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির সাক্ষ্য দেয়।

অলিভার ক্রম্‌ওয়েল

চার্ল্‌সের প্রাণদণ্ড ও ক্রম্‌ওয়েলের শাসন—১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নেস্‌বির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চার্ল্‌স্ স্কটল্যাণ্ড-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের হাতে আসেন। গোপনে গোপনে পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু বধ্যভূমিতে চার্ল্‌স্ রাজকীয় মর্যাদার পরিচয় দেন, তাই অনেকে তাঁহার কুশাসনের কথা মনে রাখে না। ইহার পরবর্তী দশ বৎসর ইংল্যাণ্ডে কোন রাজা ছিল না, লর্ড প্রটেক্টর রূপে ক্রম্‌ওয়েল রাজ্য শাসন করেন। লর্ডস্ সভা পূর্বেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কমন্স সভা হইতে ক্রম্‌ওয়েল-বিরোধী সভ্যদের বহিষ্কৃত করা হইল। ক্রম্‌ওয়েলের দলে

'লেভেলার' নামে এক সম্প্রদায় ছিল, তাহারা সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাহিয়াছিল। কঠোর হস্তে তাহাদেরও দমন করা হয়। স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ প্রশমনের পর আয়ার্ল্যাণ্ড জয় করা হইল। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-প্রতিযোগী ছিল হল্যাণ্ড। তাহার বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য নেভিগেশন আইন (Navigation Law) প্রণয়ন এবং ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এই যুদ্ধে হল্যাণ্ডের খুব ক্ষতি হয়। ক্রম্ওয়েল স্পেনের নিকট হইতে জামাইকা কাড়িয়া লইয়া সেখানে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করেন। এইরূপে ইংল্যাণ্ড প্রতিযোগী হল্যাণ্ডকে হটাইয়া দিয়া বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অধিকারের পথ পরিষ্কার করে।

দ্বিতীয় চার্ল্স্—ক্রম্ওয়েলের পুত্র রিচার্ড রাজ্যশাসনের যোগ্য ছিলেন না। সেজন্য ক্রম্ওয়েলের মৃত্যুর পর সেনাপতি মঙ্ক্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্ল্সের পলাতক পুত্র দ্বিতীয় চার্ল্স্কে ফিরাইয়া আনেন। অন্তরে অন্তরে স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও চার্ল্স্ প্রকাশ্যে পার্লামেণ্টকে চটাইতে সাহস করিলেন না। তিনি প্রথম হইতে বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। দরবারে বহিল দুর্নীতির স্রোত। অর্থাভাববশতঃ তিনি ফরাসীদেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের শরণাপন্ন হন। তিনি ফ্রান্সের সহযোগিতায় হল্যাণ্ডের সহিত দুইবার যুদ্ধ করেন ও ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইয়ের সহিত গোপন সন্ধি করিয়া অর্থ ও সামরিক

দ্বিতীয় চার্ল্স্

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। ইহার সর্ত ছিল—চার্ল্‌স্ ক্যাথলিক ধর্ম ইংল্যাণ্ডে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। আপাততঃ এক ঘোষণাপত্র দ্বারা তিনি ক্যাথলিকদের স্বার্থবিরোধী আইন প্রত্যাহার করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রকাশ্যে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

দ্বিতীয় জেম্‌স্—চার্ল্‌সের ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্ প্রকাশ্যে ক্যাথলিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, রাজা ইচ্ছা করিলে ক্যাথলিক স্বার্থঘাতী আইনের প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারেন বা একেবারেই বাতিল করিয়া দিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আইন সম্বন্ধেই তিনি উক্ত অধিকার দাবী করিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে তিনি ক্যাথলিক নিয়োগ করিতে লাগিলেন, 'হাই কমিশন কোর্ট' পুনরায় স্থাপন করিলেন এবং দ্বিতীয় বার ক্যাথলিকদের প্রতি তাঁহার করুণা ঘোষণা করিলেন (Declaration of Indulgence)। এই ঘোষণাপত্র প্রতি গীর্জায় পাঠ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সাতজন বিশপ ইহা পড়িতে রাজি না হওয়ায় তাঁহাদের বিচার হইল। বিচারে অবশ্য তাঁহারা মুক্তি পাইলেন।

দ্বিতীয় জেম্‌স্

এ সময় জেম্‌সের এক পুত্র-সন্তান জন্মিল। ভবিষ্যতে এই রোমান ক্যাথলিক শিশু ইংল্যাণ্ডের রাজা হইবে এই আশঙ্কায় দেশের প্রধান

ব্যক্তিরা জেম্‌সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা জেম্‌সের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরীর স্বামী—হল্যাণ্ডের প্রটেস্টান্ট রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়ামকে ইংল্যাণ্ডের রাজা হইতে অনুরোধ করিলেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর উইলিয়াম সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করিলেন। আপোষের চেষ্টায় বিফল হইয়া জেম্‌স্ রাজ্য ত্যাগ করেন। এইভাবে প্রায় বিনা রক্তপাতে গৌরবময় বিপ্লব সম্পন্ন হইল। উইলিয়াম ও মেরী একযোগে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

গৌরবময় বিপ্লবের ফল—সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতার অধিকারী রাজা না পার্লামেণ্ট—এই প্রশ্নই ছিল স্টুয়ার্ট বংশ ও পার্লামেণ্টের শতাব্দীব্যাপী বিরোধের মূল। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে তাহার চূড়ান্ত সমাধান হইল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'অধিকার-বিধান' বা Bill of Rights প্রণয়ন করিয়া পার্লামেণ্ট রোমান ক্যাথলিকদের সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিল, আইনের প্রয়োগ বন্ধ বা বাতিল করার ক্ষমতা লোপ করিল, রাজা যে সব আদালতের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র চালাইতেন সে সব আদালত উঠাইয়া দিল, স্বাধীন নির্বাচন ও স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত মতামত ঘোষণা করিবার অধিকার স্থাপন করিল এবং স্থায়ী সৈন্যবাহিনী বে-আইনী করিয়া দিল। এখন হইতে সামরিক বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ পাশ করাইবার জন্য প্রত্যেক বৎসরই পার্লামেণ্ট ডাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত রাজার কোন কর বসাইবার ক্ষমতা লোপ পাইল। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে Act of Settlement নামক আর একটি বিধান দ্বারা স্থির হইল রাজা ইচ্ছামত বিচারকদের বরখাস্ত করিতে পারিবেন না এবং রাজা ক্ষমা করিলেও কমন্স সভা অপরাধী মন্ত্রীদের বিচার করিতে পারিবে। মন্ত্রীরা এতদিনে আপন কার্যকলাপের জন্য

পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী হইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইল। এই সব বিধানের ফলে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার কোন উপায় রহিল না। ইংল্যাণ্ড গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

খ্রীষ্টাব্দে
- ১৬০৩ প্রথম জেম্‌সের সিংহাসনে আরোহণ
- ১৬২৮ অধিকারের আবেদন (Petition of Right)
- ১৬৩৭ হ্যাম্পডেনের বিচার
- ১৬৪০ দীর্ঘ পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ
- ১৬৪১ গ্র্যাণ্ড রিমন্‌স্ট্র্যান্স
- ১৬৪২ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ
- ১৬৪৯ চার্ল্‌সের শিরশ্ছেদ
- ১৬৫৮ ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যু
- ১৬৬০ দ্বিতীয় চার্ল্‌সের রাজ্যলাভ
- ১৬৮৮ তৃতীয় উইলিয়ামের ইংল্যাণ্ডে আগমন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—পূর্বেই বলা হইয়াছে, আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছিল। সিংহাসনে উত্তরাধিকার লইয়া ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। কেন্দ্রীয় শক্তি যতই দুর্বল হইয়া পড়ে ততই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণ সাম্রাজ্যের

প্রহসনকে মরণাঘাত হানিল। ১৭৪৮ ও ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আহমদ শাহ আবদালির উপর্যুপরি আঘাতে মুঘল সৈন্যবাহিনীর শেষ প্রতিরোধ-শক্তি লুপ্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে আসফ্‌জাহ্‌ নিজাম-উল্‌-মুল্ক্‌, অযোধ্যায় সাদাৎ খাঁ, বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ অনেকদিনই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আফগান আক্রমণের সুযোগ লইয়া শিখেরা পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহারাই আফগানদের বিতাড়িত করিল। সূরজমলের নেতৃত্বে ভরতপুরের জাঠেরা আগ্রা অঞ্চলের অনেকখানি দখল করিয়া লইল। মারাঠারা স্বভাবতঃই মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইল। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও খান্দেশ, মধ্যভারত, হায়দরাবাদ ও কর্ণাটকের কতকাংশ জয় করেন এবং দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখী নামক কর আদায় করিতে থাকেন। বাজীরাও ভারতের সমস্ত হিন্দুরাজ্য একত্র করিয়া হিন্দু পাদশাহী স্থাপনের স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাওয়ের আমলে সে আদর্শ নষ্ট হইল, মারাঠারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে চৌথ আদায় ও বাৎসরিক লুট আরম্ভ করিল। মারাঠা বর্গীরা এত বড় বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছিল যে বাংলা দেশে মায়েরা তাহাদের নাম করিয়া দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়াইত। দক্ষিণে হায়দার আলি ও নিজাম এবং বাংলায় আলিবর্দি খাঁ ইহার কিছুটা প্রতিকার করিলেও, দিল্লী ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলে দিন দিন মারাঠা-প্রতাপ বাড়িতে থাকে। রাজপুতেরা দিল্লীর কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া ক্রমশঃ মারাঠাদের প্রভাবাধীন হইল। পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব লইয়া মারাঠা-আফগানে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা আহমদ শাহ আবদালির নিকট

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যে সংহত যুক্তরাষ্ট্র তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, এ আঘাতে তাহা ভাঙিয়া গেল। কিছুকাল পরে সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লীর মসনদে বসাইয়া মহাদাজী সিন্ধিয়া বাদশাহী রাজধানীর সর্বময় কর্তা হইলেন বটে, কিন্তু ঈর্ষ্যান্বিত হোলকার, গায়কোয়াড়, পেশোয়া ও ভোঁসলা প্রভৃতি অন্য মারাঠা নায়কগণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করায় মারাঠারা দুর্বল হইয়া পড়িল।

কর্ণাটে ফরাসী ও ইংরাজদের সংঘর্ষ—এই অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইল বিদেশী বণিক—ফরাসী ও ইংরেজ। ইউরোপের জিনিস ভারতে বিক্রয় হইত না; ভারতীয় পণ্য কিনিবার জন্য ইহাদের আনিতে হইত সোনা বা রূপা। সে রকম অর্থ কি ফরাসী কি ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না। সুতরাং পণ্ডিচেরীর বিচক্ষণ শাসনকর্তা ডুপ্লে ভাবিলেন, যদি ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসার মূলধন তোলা যায় তবে আর চিন্তা কি! ছলে বলে বা কৌশলে অতবড় দেশটার কিছু অংশ অধিকার করিয়া লইয়া তাহার রাজস্ব ব্যবসাতে খাটাইতে পারিলে সমস্যা চুকিয়া যায়। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে এভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজদের তাড়ানো যায়। ঘটনাচক্র ফরাসীদের সাহায্য করিল।

ডুপ্লে

দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী ও কর্ণাটের নবাবী পদ লইয়া গৃহবিবাদ

চলিতেছিল। ডুপ্লে সুবাদার পদের জন্য মুজফ্‌ফর জঙ্‌-কে এবং নবাবী পদের জন্য চাঁদা সাহেবকে সাহায্য করিবেন স্থির করিলেন। ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। কর্ণাটে ফরাসী-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া মাদ্রাজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ আপন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হইলেন এবং সুবাদার পদের জন্য নাসিরজঙ্‌কে ও নবাবী পদের জন্য আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ আলি ত্রিচিনোপল্লীতে অবরুদ্ধ হইলেন, নাসিরজঙ্‌ও ফরাসীদের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। ফরাসী সেনাপতি বুসির অধীনে একদল সৈন্য মুজফ্‌ফর জঙ্‌কে হায়দরাবাদের গদিতে বসাইতে চলিল। মধ্যপথে তিনিও নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎ জঙ্‌কে সুবাদার মনোনীত করিলেন।

ক্লাইভ

ডুপ্লের স্বপ্ন যখন সফল হয় হয়, তখন ক্লাইভ আসিয়া হতাশ্বাস ইংরাজদের মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভের জন্ম হয়। মাত্র সতের বৎসর বয়সে কোম্পানীর এক সামান্য কেরাণীর কাজ লইয়া তিনি আসেন মাদ্রাজের কুঠিতে। দুঃসাহসিক কাজে তাঁহার জোড়া ছিল না, নেতৃত্ব ছিল তাঁহার সহজাত। পাঁচশত সৈন্য লইয়া তিনি চাঁদা সাহেবের রাজধানী আর্কট অধিকার করেন। বাধ্য হইয়া চাঁদা সাহেবকে ত্রিচিনোপল্লী ত্যাগ করিতে হয়। মহম্মদ আলির অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলেন এবং চাঁদা সাহেব

নিহত হইলে কর্ণাটের নবাবী অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে ক্লাইভ ফরাসী সেনাপতিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কর্ণাটকে ডুপ্লের নীতি বিফল হইলে ফরাসী সরকার তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে এক সাময়িক সন্ধি হয়।

কিন্তু চার বৎসর পর আবার যুদ্ধ বাধে। ইংরাজদের সমস্ত শক্তি তখন বাংলায় নিয়োজিত। তথাপি ক্লাইভ মাদ্রাজ রক্ষার্থে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা মসুলীপত্তন দখল করিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কূট ফরাসী সেনাপতি লালীকে বন্দীবাসের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। পর বৎসর পণ্ডিচেরীর পতন হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা মহম্মদ আলি কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সলাবৎ জঙ্ নিহত হওয়ায় হায়দরাবাদে ফরাসী-প্রভাব লুপ্ত হইল। উত্তর সরকার নামে নিজামের রাজ্যের এক বৃহদংশ ইংরাজরা এই সময় হইতে পায়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

বাংলায় ইংরাজ ঃ পলাশীর যুদ্ধ—এদিকে বাংলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আসল ভিত্তি রচিত হইতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতায় বাণিজ্যকেন্দ্র রক্ষার জন্য ইংরাজরা এক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পাইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে তাহার নাম দেওয়া হয় ফোর্ট উইলিয়াম। দাক্ষিণাত্যে যখন ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ফরাসীদের আকস্মিক আক্রমণ হইতে কলিকাতাকে বাঁচাইবার জন্য ইংরাজরা দুর্গ সংস্কারে ও অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় মন দেয়। এই লইয়া বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত তাহাদের বিরোধ বাধিল। সিরাজ কলিকাতা দখল করিয়া লইলেন। মাদ্রাজ হইতে ওয়াটসন ও ক্লাইভ আসিলেন

এ অপমান ও ক্ষতির প্রতিশোধ লইতে। অল্পায়াসে কলিকাতার পুনরুদ্ধার হইল। দ্বিতীয় বার কলিকাতা বিজয় করিতে আসিয়া সিরাজ ক্লাইভের হাতে এমন ঘা খাইলেন যে তাঁহার ক্ষতিপূরণ দিবার সর্তে সন্ধি করিতে হইল। ক্লাইভ চন্দননগর দখল করিবার জন্য নবাবের অনুমতি চাহিলেন। একমাত্র ফরাসীরাই নবাবের মিত্র হইতে পারিত এবং উভয়ে একযোগে ইংরাজদের আক্রমণ করিলে ফল কি হইত বলা যায় না। কিন্তু দুর্বল অস্থিরমতি সিরাজ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ইংরাজকে চন্দননগর অধিকার করিতে দিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলার ঔদ্ধত্যে ও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া মীরজাফর, রাজবল্লভ, প্রভৃতি একদল ওমারহ এবং তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ক্লাইভ তাহাতে যোগ দিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে এক যুদ্ধের অভিনয় হইল। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ফরাসী সেনাপতি সিন্ফ্রে পরাভূত হইলে যুদ্ধের অবসান হইল, বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজকে বরণ করিল।

সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করিতে গিয়া ধৃত হইলেন। অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। বাংলার নবাব হইলেন বিশ্বাসহন্তা মীরজাফর। অবশ্য প্রকৃত কর্তৃত্ব গেল ইংরাজদের হাতে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে মীরজাফর

গদিচ্যুত হইলেন। মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম জেলা সমর্পণ করিয়া ও প্রচুর উপঢৌকন ইংরাজদের দিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিম সিংহাসন লাভ করিলেন।

অনেকদিন হইতে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার দাবী তুলিয়াছিল। এখন তাহারা লবণ, তামাক, সুপারী, ধান, চাল প্রভৃতির ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিল। দেশীয় বণিকরা মারা পড়ে দেখিয়া মীরকাশিম ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে তিনি ইংরাজদের নিকট পরাজিত হইলেন। নবাবের পদে ফিরিয়া আসিলেন মীরজাফর।

এই সময় ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্ণর হইয়া বাংলায় আসেন। মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা নজরাণা এবং কোরা ও এলাহাবাদ দিয়া তিনি সুবা বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের
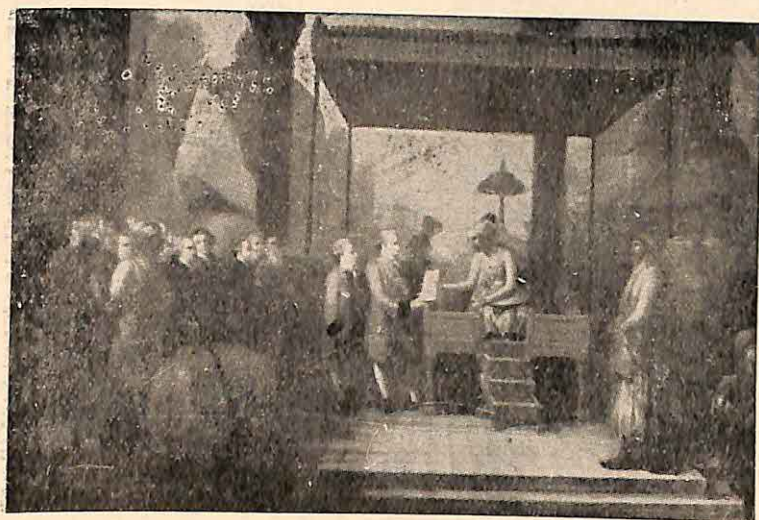
ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ
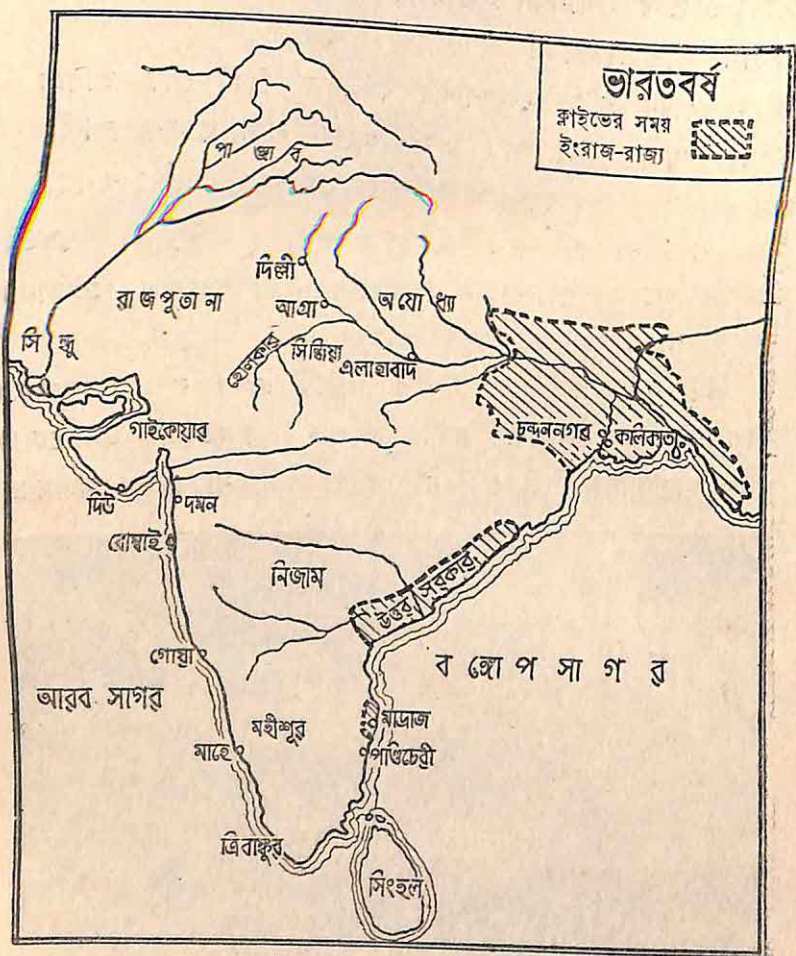
বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

ক্ষমতা পাইলেন। কার্যতঃ কিন্তু নবাবের লোকেরাই রাজস্বসংগ্রহ ও বিচারকার্য চালাইতে লাগিল। ইংরাজরা রাজ্যশাসনের কোন দায়িত্ব লইল না। ফলে শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা এত বাড়িয়া গেল যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ সালে) বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ইহার পর গভর্ণর হইয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর নিযুক্ত হইল, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বসিল, যাহারা জমির জন্য সর্বোচ্চ খাজনা দিতে রাজি হইল তাহাদের সহিত জমির বন্দোবস্ত করা হইল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজ্যবিস্তার : মহীশূর যুদ্ধ—ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রাজ্যবিস্তারের দুটি প্রধান বাধা ছিল—মহীশূরে হায়দার আলি এবং মারাঠা। অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যান্বেষী হায়দার মহীশূর দরবারে সামান্য কাজে ঢুকিয়াছিলেন। অশিক্ষিত হইলেও অনমনীয় সঙ্কল্প, অসীম সাহস ও কূটবুদ্ধির বলে তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রণকৌশল এবং সৈন্য চালনার নৈপুণ্য শত্রুরও বিস্ময় উদ্রেক করিত। পরাজয়ে তিনি অধীর হইতেন না। শাসনে কঠোর হইলেও তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈর্ষ্যান্বিত নিজাম ও মারাঠা ইংরাজদের সহিত মিলিয়া হায়দারকে

ওয়ারেন হেস্টিংস

আক্রমণ করে। নিজাম একবার হায়দার একবার ইংরাজদের দিকে ঝুঁকিতে থাকেন। হায়দার মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়েন। ইংরাজরা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইহার কিছুদিন পরে মারাঠারা হায়দারকে আক্রমণ করিলে তিনি সন্ধির সর্তমত ইংরাজদের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক, ইংরাজরা হায়দারের রাজ্যের অন্তর্গত মাহে দখল করিল। ক্রুদ্ধ হায়দার নিজাম ও মারাঠার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর্কট দখল করিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস অতি কৌশলে ভোঁসলা, সিন্ধিয়া ও নিজামকে হায়দারের দল হইতে সরাইয়া আনিলেন। সেনাপতি স্যার আয়ার কূট পোর্টো নোভোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কিছু পরে হায়দারের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র টিপু যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি অনুসারে পরস্পর পরস্পরকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

হায়দার আলি

টিপু পিতার মত বীর হইলেও বিচক্ষণ ছিলেন না। তবে সমসাময়িক রাজাদের মত তিনি দুশ্চরিত্রও ছিলেন না। ঈশ্বরে ছিল তাঁহার গভীর বিশ্বাস, নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং শাসনকার্যে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা। স্বভাব তাঁহার নিষ্ঠুর ছিল সন্দেহ নাই, তবে তিনি শত্রু

ছাড়া কাহারও প্রতি পারতপক্ষে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। ইংরাজদের তিনি সকলের চেয়ে বড় শত্রু মনে করিতেন। তাহাদের দমন করিবার জন্য তিনি ফরাসীদের সহিত মিত্রতা করিতে চাহিয়াছিলেন। এমন কি, খাস ফ্রান্সে দূতও পাঠাইয়াছিলেন।

টিপু সুলতান

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ সুরু হয়। তখনকার বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস স্বয়ং রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলে সন্ধি হয়। তাহার ফলে ইংরাজরা মালাবার, কুর্গ ও বড় মহাল পায় এবং টিপুর দুই ছেলেকে প্রতিভূ স্বরূপ কলিকাতায় লইয়া আসে। পরবর্তী বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ মহীশূর যুদ্ধ ঘটে। প্রাসাদের দ্বারে বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু মৃত্যু বরণ করেন। মহীশূরের এক অংশে প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ পুনঃস্থাপন করিয়া বাকীটা নিজাম ও ইংরাজ ভাগ করিয়া লয়।

ইংরাজ ও মারাঠা—পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কিছুদিন পরেই পেশোয়া মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা আবার রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করিল। দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম মারাঠাদের করায়ত্ত হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে মারাঠারা প্রবল বাধা দিবে। মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর মারাঠাদের গৃহবিবাদ সুরু হইল। একদিকে

মৃত পেশোয়ার খুল্লতাত রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা, অন্যদিকে তাঁহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণের পক্ষে সে যুগের রাজনীতি-ধুরন্ধর—না না ফ ড় ন বি শ। বোম্বাইয়ের ইংরাজ সরকারের অনেকদিন হইতে সালসেট ও বেসিন বন্দরের উপর লোভ ছিল। রঘুনাথ রাও সেগুলি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ইংরাজরা তাঁহাকে সমর্থন করিল। হেস্টিংসের তৎপরতা ও কূটবুদ্ধির গুণে শেষ পর্যন্ত ইংরাজরা জয়ী হইল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবাইয়ের সন্ধিতে মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু ইংরাজরা সালসেট পায়।

নানা ফড়নবিশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে একে একে বিজ্ঞ বিচক্ষণ মারাঠী নেতাদের মৃত্যু হইল। তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, দৌলতরাও সিন্ধিয়া, যশোবন্ত রাও হোলকারের মত অনভিজ্ঞ ও হঠকারী নেতা। পুণা দরবারে প্রতিপত্তি স্থাপনের ব্যাপারে সিন্ধিয়া ও হোলকারের কলহ উপস্থিত হইলে বাজীরাও লর্ড ওয়েলেসলীর সাহায্য চান ও বেসিনের সন্ধি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেন। হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলী ও লেক তাঁহাদের হারাইয়া দেন। এই যুদ্ধের ফলে

ভারতবর্ষ
ওয়েলেসলীর সময় ইংরাজ রাজ্য
শিখ
দিল্লী
নে পা ল
অযোধ্যা
রাজপুত
সিন্ধু
হোলকার
সিন্ধিয়া
এলাহাবাদ
গাইকোয়ার
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
ভোঁসলা
বোম্বাই
পেশোয়া
নিজাম
ব ঙ্গো প সা গ র
আরব সাগর
মহীশূর
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
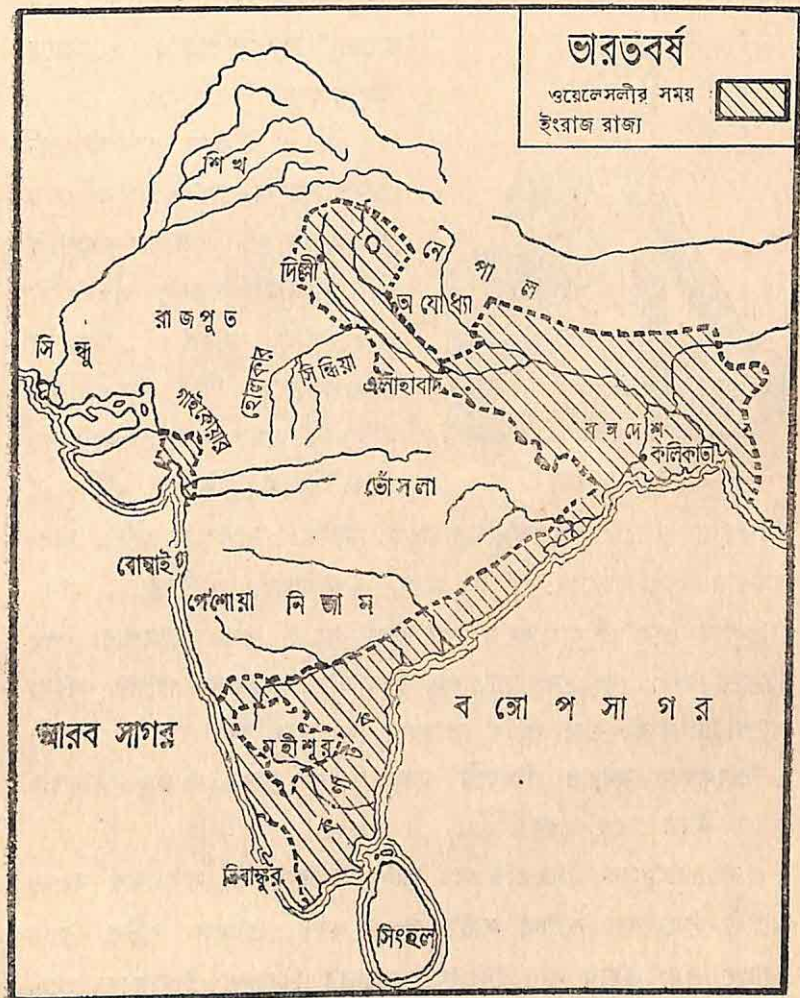
ইংরাজরা কটক, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, আহম্মদনগর, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যখণ্ড পায়, সম্রাট শাহ্ আলম তাহাদের হাতে আসেন এবং দেশীয় রাজ্যে ফরাসী-প্রভাব একেবারে নির্মূল হয়।

লর্ড ওয়েলেসলী

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড হেস্টিংসের আমলে তৃতীয় বা শেষ মারাঠা যুদ্ধ হয়। মারাঠা রাষ্ট্রগুলি পিণ্ডারী নামক একদল লুণ্ঠনকারী দস্যু পোষণ করিত। তাহাদের দমন করিতে গিয়া মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বাজীরাও, হোল্‌কার ও ভোঁসলা অধীনতামূলক মিত্রতার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মারাঠারা নাগপুর, সীতাবলদি, অস্তি, মাহিদপুর প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়। তখন পেশোয়া পদ বিলোপ করা হয় এবং সাতারায় শিবাজীর বংশধরকে স্থাপন করিয়া পেশোয়ার বাকী রাজ্য বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোঁসলা ও হোলকার নর্মদার তীরবর্তী রাজ্য ছাড়িয়া দেন এবং অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন।

অধীনতামূলক মিত্রতার অর্থ বৃটিশ আশ্রয় ও সাহায্যের বদলে অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির সহিত সম্বন্ধ বর্জন, একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ এবং ইহার ব্যয় নির্বাহার্থ রাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজদের হাতে সমর্পণ। ওয়েলেসলী ইহার ব্যাপকতম প্রয়োগ করেন, লর্ড হেস্টিংসের আমলে ইহার পরিণতি হয়। ইহার ফল বিষময়। ইংরাজরা কুশাসন

ভারতবর্ষ
লর্ড হেস্টিংসের সময় ইংরাজ রাজ্য
রণজিৎ সিংহ
নেপাল
দিল্লী
অযোধ্যা
রাজপুতানা
জয়পুর
আগ্রা
আসাম
সিন্ধু
যোধপুর
আজমীর
এলাহাবাদ
বিহার
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
নাগপুর
বোম্বাই
পুনা
নিজাম
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
মাদ্রাজ
আরব সাগর
পণ্ডিচেরী
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
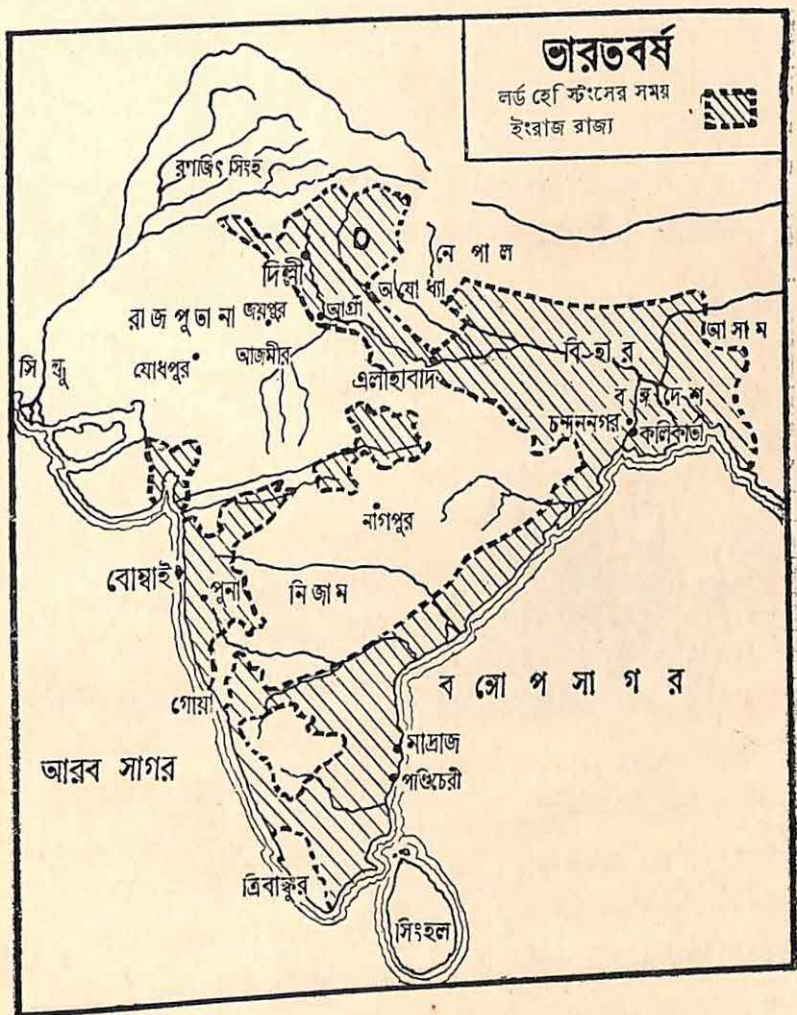
নিবারণের কোন দায়িত্ব নিলেন না, অথচ রাজা অত্যাচারী হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব নিলেন। ক্রমশঃ দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রজার ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন হইলেন এবং বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। অযোধ্যার নবাবের কুশাসন এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে কিছুকাল পরে বড়লাট লর্ড ডালহৌসী নবাবকে সরাইয়া দিয়া অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে বাধ্য হন।

ইংরাজ ও শিখ : রণজিৎ সিংহ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখেরা আফগানদের তাড়াইয়া পাঞ্জাব অধিকার করে। তাহারা বিভিন্ন মিস্‌ল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। রণজিৎ সিংহের অসামান্য প্রতিভা তাহাদের সংহত করিয়া শক্তিশালী শিখ-রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল। রণজিতের জন্ম হয় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র বার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া আফগান-রাজ তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু রণজিৎ শীঘ্রই স্বাধীন হন এবং শতদ্রুর পশ্চিম পারের মিস্‌ল্‌গুলি একে একে গ্রাস করিতে থাকেন। শতদ্রুর পূর্বপারে প্রথমে মারাঠা ও পরে ইংরাজ তাঁহার অগ্রগতিতে বাধা দেয়। সিন্ধুপ্রদেশেও ইংরাজদের জন্য তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি কাংড়া, আটক, পেশোয়ার, মূলতান, কাশ্মীর প্রভৃতি জয় করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন—তিনি ইংরাজদের সঙ্গে সদ্ভাব

রণজিৎ সিংহ

ভারতবর্ষ
ডালহৌসীর সময় ইংরাজ রাজ্য
কাশ্মীর
আফগানিস্তান
পাঞ্জাব
তিব্বত
রামপুর
দিল্লী
নেপাল
রাজপুতানা
অযোধ্যা
লক্ষ্ণৌ
আজমীর
জয়পুর
সিন্ধু
যোধপুর
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বিহার
আসাম
বঙ্গদেশ
রেওয়া
চন্দননগর
গুজরাট
কলিকাতা
দমন
নাগপুর
বোম্বাই
(নিজাম)
হায়দরাবাদ
গোয়া
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
মহীশূর
মাদ্রাজ
মাহে
পণ্ডিচেরী
কারিকল
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
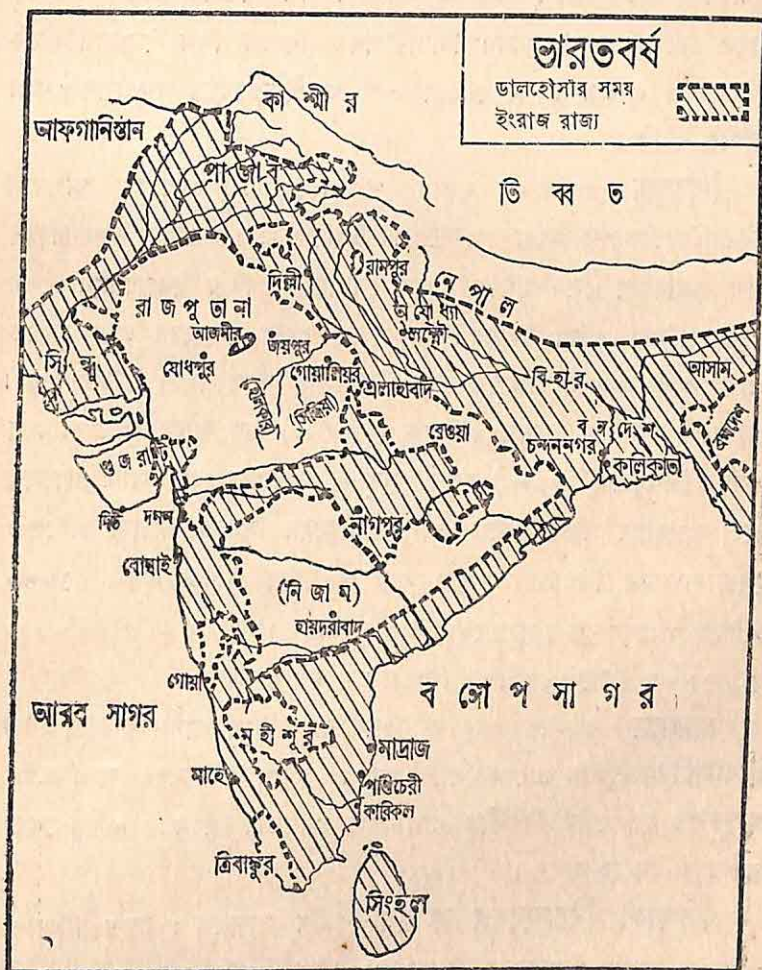
রাখিয়া যান। দেখিতে তিনি কুৎসিত ছিলেন, স্বভাবও ছিল উচ্ছৃঙ্খল। তথাপি সুশাসক রূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ভিক্তর জাকমঁ তাঁহাকে 'ক্ষুদে নেপোলিয়ান' আখ্যা দিয়াছিলেন। কারণ শিখ সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া এবং জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করা তাঁহার কীর্তি।

শিখযুদ্ধ—রণজিতের মৃত্যুর পর (১৮৩৯) তাঁহার অপদার্থ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে গৃহবিরোধ উপস্থিত হয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিখ ওমরাহরা সে অগ্নিতে ইন্ধন যোগান। শিখ সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ায়। লাহোর দরবার ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধে লিপ্ত করিতে চায়। হার্ডিঞ্জের আমলে প্রথম শিখযুদ্ধ (১৮৪৫) এবং ডালহৌসীর আমলে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ (১৮৪৮) হয়। মুদ্‌কি, ফিরোজ শা, আলিওয়ালের যুদ্ধে সাধারণ শিখ সৈন্য অপূর্ব বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিলেও সৈন্যাধ্যক্ষদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাদের পরাজয় হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপিয়ার সিন্ধুপ্রদেশ দখল করেন।

ব্রহ্মযুদ্ধ—বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের আমলে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। ইংরাজরা আরাকান ও তেনাসিরিম পায়। বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ নষ্টের অজুহাতে ডালহৌসী দ্বিতীয় বার ব্রহ্ম আক্রমণ করেন। এবার পেগু বৃটিশ অধিকারে আসে।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ—বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও খ্রীষ্ট ধর্মের সংঘাতে ভারতের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর আলোড়ন উঠিয়াছিল। ভূমি-সম্পর্কিত সংস্কারের ফলে বহু জমিদার ও তালুকদার পিতৃপিতামহের

সম্পত্তি হারায়। কৃষক ও সাধারণ লোকের উপর বৃটিশ শাসনের চাপ বাড়ে, নানা অঞ্চলে স্থানীয় প্রতিরোধ-আন্দোলন থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে দেশীয় প্রতিভা বিকাশের পথ সংকীর্ণতর হয়। টেলিগ্রাফ ও রেলপথ স্থাপন, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম বিপন্ন বোধ করে। যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হওয়ায় সৈন্যবাহিনীর বাট্টা বা উপরি পাওনা কমিয়া যায় এবং ব্রহ্মে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় সৈন্যদের বিদেশ যাইতে বাধ্য করা হয়। পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা উপেক্ষা করিয়া ডালহৌসী অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য বাজেয়াপ্ত করেন, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের পেন্সন বন্ধ করিয়া হিন্দুদের মনে, এবং মুঘল সম্রাটকে প্রাসাদ ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়া ও অযোধ্যা দখল করিয়া মুসলমানদের মনে আঘাত দেন। নানা শ্রেণীর নানা অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে হইতে সহসা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

সিপাহীদের অধিকাংশই ছিল অযোধ্যা অঞ্চলের লোক এবং ধর্মে বর্ণ-হিন্দু। জমিজমা, জোত, বাট্টা লইয়া তাহাদের উষ্মা ত ছিলই— খাদ্য পোষাক ইত্যাদি সম্বন্ধে সামরিক নির্দেশ দেখিয়া অনেকে ভাবিল ইংরাজরা সকলকে খ্রীষ্টান করিতে চায়। যখন পশু-চর্বি দিয়া তৈরী টোটা তাহাদের দাঁতে কাটিতে বলা হইল তখন সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনা বিদ্রোহে পরিণত হইল। সমগ্র ভারতে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, দিল্লী ও এলাহাবাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে একেবারেই ছিল না এবং সৈন্যাধ্যক্ষেরা অনেকেই ছিল অপটু। সুতরাং সিপাহীরা ভাবিল সহজে জয় হইবে। উত্তর অঞ্চলে সৈন্যদের বিদ্রোহ যে জন-সমর্থন লাভ করে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রসার ও পরাজয়—মীরাট, কানপুর ও দিল্লী অধিকার করিতে সিপাহীদের বেগ পাইতে হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহীরা মিলিতভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লীর বাদশাহ ঘোষণা করে। কিন্তু নিকোল্‌সন্ দিল্লী পুনরধিকার করিলে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায়। ইহাতে মুহ্যমান না হইয়া ঝান্সির রাণী লক্ষ্মী বাঈ অসীম বীরত্বে মধ্য ভারতের বিদ্রোহীদের পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁতিয়া টোপীর সহিত যোগ দিয়া তিনি গোয়ালিয়র দখল করেন। পুরুষের মত বর্ম ও শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইয়া পুরুষের মত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন লক্ষ্মী বাঈ নিহত হন। তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসী হয়। নানা সাহেব পলাইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার আর কোন খবর পাওয়া যায় না। বিদ্রোহ দমনকালে ইংরাজদের অকথ্য অত্যাচার সিপাহীদের অত্যাচারকেও ছাড়াইয়া যায়। বড়লাট লর্ড ক্যানিং ইহা বন্ধ করেন বলিয়া ইংরাজরা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিত 'দয়ালু ক্যানিং'।

সিপাহী বিদ্রোহের ফল—সিপাহী বিদ্রোহের আঘাতে সচেতন হইয়া ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ভারতশাসন ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট হইতে বৃটিশ সরকার স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। রাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে দেশীয় রাজন্যবর্গের মর্যাদা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, প্রজার ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান দেওয়া হইবে এবং শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সরকারী চাকুরির সুযোগ দেওয়া হইবে। ভারতবাসী এই প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল ভারতশাসনে ইংরাজরা তাহাদের

সহযোগী করিয়া লইবে। সেই আশাভঙ্গের ফলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়।

খ্রীষ্টাব্দ

—১৭০৭ আওরঙজেবের মৃত্যু
—১৭৪৪-৪৮ প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ
—১৭৫০-৫৪ দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ
—১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ
—১৭৬১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ—হায়দার আলির অভ্যুদয়
—১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ
—১৭৬৫ ইংরাজ কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি
—১৭৬৭-৬৯ প্রথম মহীশূর যুদ্ধ
—১৭৭০ বাংলায় দুর্ভিক্ষ
—১৭৭৫-৮২ প্রথম মারাঠা যুদ্ধ
—১৭৮০-৮৪ দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ
—১৭৯০-৯২ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ
—১৭৯৯ চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ
—১৮০৩-০৫ দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ
—১৮১৭-১৯ তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ
—১৮২৪-২৬ প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ
—১৮৪৫-৪৬ প্রথম শিখ যুদ্ধ
—১৮৪৮-৪৯ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ
—১৮৫২ দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ
—১৮৫৭-৫৮ সিপাহী বিদ্রোহ
—১৮৫৮ রাণীর ঘোষণাপত্র—কোম্পানীর শাসনের অবসান

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি

আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশ বিস্তার—সপ্তদশ শতাব্দী বৃটিশ উপনিবেশ বিস্তারের স্বর্ণযুগ। স্পেন ও স্কটল্যাণ্ডের সহিত বিরোধের অবসান হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের উদ্যম ও মূলধন নূতন নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উপনিবেশ স্থাপনে নিয়োজিত হইল। স্পেন আমেরিকা হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য আনিয়াছিল, তাই আমেরিকাই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অর্থলোভ ব্যতীত আরও নানা কারণ ইহার পশ্চাতে ছিল। অনেকে নূতন দেশে গেল স্বদেশের অনুদার ধর্মনীতির হাত এড়াইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণ করিবার সুযোগ পাইবে বলিয়া। বিপজ্জনক জীবনের মোহও অনেককে আকর্ষণ করিল।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় প্রথম ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মে ফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে একদল পিউরিটান আমেরিকা পেঁ ছে। পরবর্তী আমেরিকানরা ধর্মপ্রবণ এই পূর্বপুরুষদের নান দেয় Pilgrim Fathers। উপনিবেশটির নাম হয় নিউ ইংল্যাণ্ড। দ্বিতীয় চার্ল্‌সের রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা স্থাপিত হয়। মেরীল্যাণ্ডে লর্ড বাল্টিমোর ও পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ায় উইলিয়াম পেন নিজ ব্যয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা ওলন্দাজ-উপনিবেশ নিউ আম্‌স্টার্ডাম দখল করে। তখন ইহার নূতন নাম রাখা হয় নিউ ইয়র্ক।

প্রথম প্রথম নূতন অধিবাসীদের অমানুষিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। খাদ্যাভাব, জলাভাব, রোগাতঙ্ক ছাড়াও ছিল আমেরিকার আদিবাসী

কা না ডা
হিউরণ হ্রদ
অণ্টেরিও হ্রদ
ইরি হ্রদ
নিউইয়র্ক
নিউহ্যাম্পশায়ার
ম্যাসাচুসেট্‌স্
কনেকটিকাট
রোড দ্বীপ
পেনাসিলভানিয়া
মেরীল্যাণ্ড
ডেলাওয়ার
আপালাশিয়ান পর্বতমালা
ভার্জিনিয়া
আ ট লা ন্টি ক
ম হা সা গ র
উত্তর
ক্যারোলিনা
দক্ষিণ
ক্যারোলিনা
জর্জিয়া
আমেরিকায়
ব্রিটিশ উপনিবেশ
(১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ)
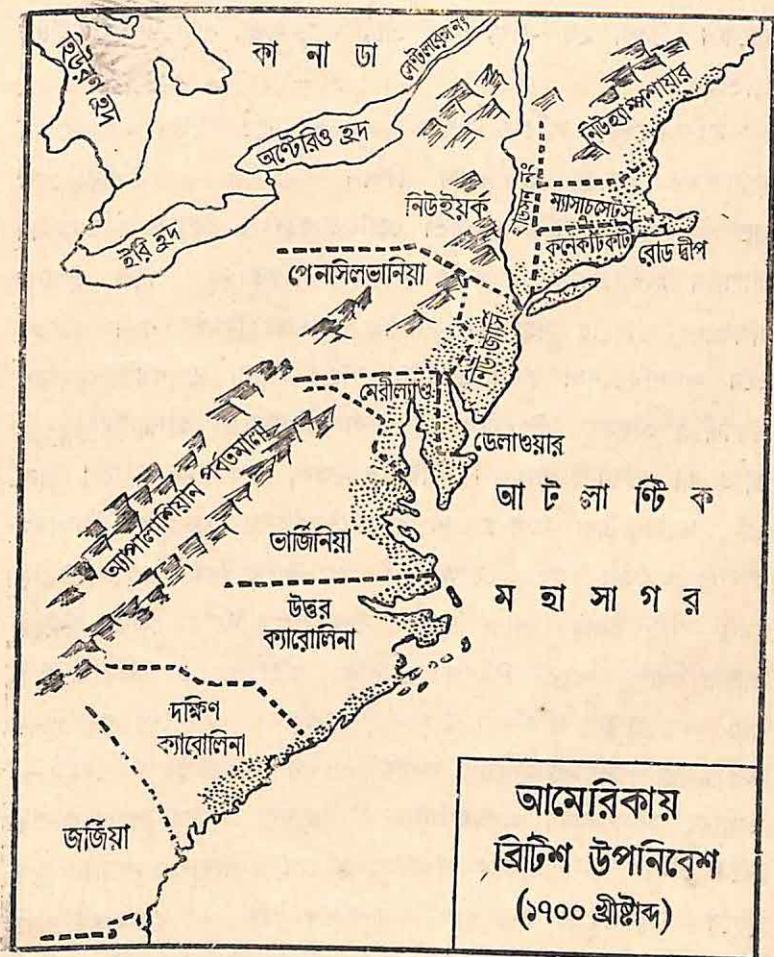
রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয়। কিন্তু ইহাতে বিচলিত না হইয়া তাহারা আদিম অরণ্য উচ্ছেদ করিয়া কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাকে। তৈরী হয় সহর, স্কুল, চার্চ, নগর-সভা, সভ্য রাষ্ট্রের বিচিত্র প্রতিষ্ঠান।

ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ইংরাজদের তেরটি উপনিবেশ ছিল। এই সকল উপনিবেশের জন্য ইংল্যাণ্ড হইতে শাসনকর্তা প্রেরিত হইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরাজ সরকার বেশী হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু ইংরাজ বণিকদের সুবিধার জন্য ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইত। তবে আমেরিকানরা তাহা এড়াইয়া যাইত নানা ভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উপনিবেশগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রায় মাতৃভূমির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। তিমির তেল, 'রাম' মদ, নিগ্রো দাস, চিনি, তামাক এবং মাল বহনের ব্যবসায়ে তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে থাকে। জুতা, মোজা, কাঁচ ও কাগজশিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে বস্ত্র ও পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ায় লৌহ শিল্পের প্রসার হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া হইয়া যায়। ফলে ইংরাজ বণিকদের মনে ঈর্ষ্যা জাগে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অবশ্য পার্লামেণ্ট কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। যেমন,—তামাক, আলকাতরা প্রভৃতি কয়েকটি জিনিস ইংল্যাণ্ড ছাড়া কোথাও বেচা চলিবে না। কেবল ইংল্যাণ্ড হইতেই ইউরোপীয় পণ্য কিনিতে হইবে। ব্যবসায়ের জন্য পশমী কাপড়, টুপী ও লোহার পাত তৈরী করা চলিবে না। এই সব আইন কার্যকরী করিবার বিশেষ চেষ্টা না হইলেও, আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য ও বাদানুবাদের সূত্রপাত এইখানে।

উত্তর আমেরিকার কর্তৃত্ব লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর বিবাদ যতদিন চলিতেছিল ততদিন মাতৃভূমির সঙ্গে উপনিবেশগুলির মনোমালিন্য প্রবল হয় নাই। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩) শেষে উত্তর আমেরিকায় ফরাসী-শাসনের উচ্ছেদ হইল, ক্যানাডা ইংরাজের হাতে আসিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রেন্‌ভিল ভাবিলেন—আমেরিকা রক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডের অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে, কর বসাইয়া ইহার কিয়দংশ তোলা উচিত। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চিনি, কফি, রেশম ইত্যাদি দ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়ান হইল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ট্যাম্প আইন' দ্বারা সর্ববিধ দলিলপত্র, খবরের কাগজ ও পুস্তিকার উপর কর বসান হইল। আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর—বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী ও উকিলদের—স্বার্থ নষ্ট হইল। তাহাদের প্রতিবাদের ফলে ইংরাজ সরকার আমেরিকায় সৈন্য পাঠানোর আয়োজন করিল এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যের আদান-প্রদান বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।

ইংরাজ সরকারের এই ব্যবস্থা আমেরিকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সভায় সমিতিতে ঘোষণা করা হইল—যে হেতু পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নাই, সে হেতু উপনিবেশের উপর কর বসাইবার অধিকারও পার্লামেণ্টের নাই। বিলাতী পণ্য বর্জন করা হইল। ইংরাজ সরকার স্ট্যাম্প আইন বাতিল করিয়া দিলেও চা, কাঁচ এবং কাগজের উপর আমদানি শুল্ক বসাইল। বোস্টন বন্দরে একদল আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান সাজিয়া চায়ের জাহাজে উঠে এবং সমস্ত চা জলে ফেলিয়া দেয়। এই ঘটনাকে "বোস্টনের চায়ের আসর" (Boston Tea Party) বলা হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্তৃপক্ষ বন্দর বন্ধ করিয়া দিল। বিনা অনুমতিতে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ

হইল। নাগরিকদের বাড়ীতে ইংরাজ সৈন্যের থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

স্বাধীনতার যুদ্ধ—আমেরিকার লোকেরা এই দমননীতি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়ায় উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা সমবেত হইল। এই কংগ্রেস বিদেশী দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করিল এবং আমেরিকার স্বার্থবিরোধী বিধানগুলির প্রত্যাহার দাবী করিল। ইহার অল্পদিন পরেই বোস্টনের অন্তঃপাতী লেক্সিংটনে উভয় পক্ষের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর আরম্ভ হইল এইভাবে।

বার্ক

যে সকল ইংরাজ আমেরিকার সঙ্গে একটা আপোষ চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাগ্মিবর বার্ক প্রধানতম। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি আমেরিকায় ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া সাত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চালান।

স্বাধীনতা ঘোষণা—১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিল কংগ্রেস। এই ঘোষণাপত্রটি জেফার্সন লিখিয়াছিলেন। মানুষ কতকগুলি প্রকৃতি-দত্ত মৌলিক অধিকার লইয়া জন্মায়; তাহাদের মধ্যে প্রধান—নিরাপদ, স্বাধীন ও সুখী জীবন যাপন করিবার অধিকার।

রাষ্ট্র তাহা অস্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ বিধেয়। ইহাই ছিল এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্রের প্রতিপাদ্য। এখন পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর ৪ঠা জুলাই আমেরিকার অধিবাসীরা স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন করে।

জর্জ ওয়াশিংটন—স্বাধীনতা-সমরে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার জয় হয়। সে জয়ের পশ্চাতে ছিল ঔপনিবেশিক সৈন্যদলের সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সুনিপুণ নেতৃত্ব। তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়ার এক ধনী জমিদার। যৌবনে ইংরাজদের অধীনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হইয়া তিনি অশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের দল লইয়া এক সংহত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কম কষ্ট সহিতে হয় নাই। সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, পরাজিত সৈন্যদের নিরন্তর প্রেরণা দিতে হইয়াছে, তেরটি উপনিবেশের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ অতি কৌশলে মিলাইতে হইয়াছে। মৃত্যুভয় তাঁহার ছিল না, বিপদে ছিল অসামান্য ধৈর্য। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও মহৎ স্বভাব সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের চেষ্টায় ফ্রান্স আমেরিকার পক্ষে যোগ দেয়। নৌশক্তির বলে ইংরাজরা উপকূলবর্তী সমস্ত বন্দর অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে তাহারা সুবিধা করিতে পারে নাই। সারাটোগায় এক ইংরাজবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং ইয়র্কটাউনের যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস (পরে ভারতের বড়লাট) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি অনুসারে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

সেনাপতি বেশে জর্জ ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম—যুদ্ধের সময় তেরটি উপনিবেশ মিলিত হইয়াছিল, যুদ্ধের শেষে স্বাধীন হইয়া প্রত্যেকে ভিন্ন পথ ধরিতে চাহিল। নিন্তু নানারকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় বিব্রত হইয়া

নেতারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে তৎপর হইলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় পঞ্চান্ন জন প্রতিনিধি লইয়া এক ফেডারেল কন্‌ভেন্‌শান সংবিধান প্রস্তুত করিতে বসিল। হ্যামিল্টন, ম্যাডিসন, ফ্রাঙ্ক্‌লিন ও ওয়াশিংটন ইহার বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধান অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল, নূতন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের স্থান হইল না। অদ্যাপি যুক্তরাষ্ট্রে এই সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য চলিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমোন্নতি—স্বাধীনতা লাভ এবং সংবিধান রচনার পর তেরটি উপনিবেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইল। উপনিবেশগুলির পশ্চিম-সীমান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যে বিরাট জনশূন্য ভূভাগ পড়িয়া ছিল তাহার মৃত্তিকা ছিল অতি উর্বর, অরণ্য ও খনিজ সম্পদের তুলনা ছিল না। সেখানে গড়িয়া উঠিল নূতন নূতন উপনিবেশ। কিছুদিন স্বায়ত্ত-শাসনের শিক্ষানবিশী করিয়া তাহারাও যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য হইল। এভাবে আরও পঁয়ত্রিশটি নূতন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। তাহারাও যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ। তেরটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র সুরু হয়, আজ তাহার অঙ্গীভূত রাষ্ট্রের সংখ্যা আটচল্লিশ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লব

সামন্তশ্রেণী ও চার্চ—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে শ্রেণী-বৈষম্য চরমে উঠিয়াছিল। সামন্তপ্রথা ইংল্যাণ্ড হইতে বিদূরিত হইলেও ফ্রান্সে তখনও বলবৎ ছিল। বাহির হইতে রাজাকে স্বৈরাচারী মনে হইত, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সামন্তপ্রথার দাস। অভিজাত শ্রেণীকে কোন কর দিতে হইত না, অথচ তাহারাই সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। জমিদারী নায়েব-গোমস্তার হাতে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা ভার্সাই দরবারে আসিয়া বাস করিত। তাহাদের বিলাস-ব্যসনের

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পোষাক

খরচ বহন করিত প্রজাসাধারণ। তাহাদের খাজানার উপর দিতে হইত ফসলের দশমাংশ, জমিদারীর ভিতর দিয়া পণ্য চলাচলের জন্য দিতে হইত শুল্ক। জমিদারের রুটি তৈয়ারী করার কারখানায় বেশী খরচে রুটি তৈয়ারী করাইতে হইত, অনেক সময় বেগার খাটিতেও হইত। চার্চের হাতেও বড় বড় জমিদারী ছিল এবং যাজকদের কোন কর দিতে

হইত না। সামন্তশ্রেণীর মত বিশপ্‌রাও প্রজাদের নিকট পালিত পশুর ও ফসলের দশমাংশ (tithe) আদায় করিতেন।

মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণী—ইহার ফলে সমস্ত করভার গিয়া পড়িল মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণীর উপর। তাহাদের আয়কর (taille), লবণকর (gabelle) ও নানারকম বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক উন্নতির পথে ছিল অশেষ বাধা। কিন্তু করের অপেক্ষাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে অসহ্য ছিল অভিজাতদের উদ্ধত ও অভদ্র ব্যবহার। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অভিজাতদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও কর্মপটু ছিল। সুতরাং ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সামাজিক সাম্যের স্বপ্ন দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সচ্ছল কৃষকরা জমি কিনিতেছিল। কিন্তু এত কর দিয়া জমি কিনিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ অনেকের থাকিত না। তাই তাহাদেরও অসন্তোষের সীমা ছিল না। প্যারিসের মত বড় বড় সহরে কারুশিল্পীরা খাদ্যাভাবে খুব কষ্ট পাইত। তাহারা ভাবিত—সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদে তাহাদের খাদ্য-সমস্যা দূর হইবে এবং দুঃখদুর্দশা ঘুচিবে।

ভল্‌টেয়ার ও রুসো—এই সব বঞ্চিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছিল কয়েকজন মহৎ লোকের রচনায়। তাহাদের মধ্যে প্রধান ভল্‌টেয়ার ও রুসো। ভল্‌টেয়ার তাঁহার নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাতে ধর্মের অনাচার ও শাসকশ্রেণীর অপদার্থতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। যুক্তিকে অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থান দিয়া তিনি এক বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিলেন। চার্চের প্রতি আনুগত্য শিথিল হইল বলিয়া রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যও শিথিল হইল। রুসো বলিলেন, সমস্ত মানুষই সমান হইয়া স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছে—কিন্তু সমাজের দোষে তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে।

সেই আদিম সাম্য ও স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে বর্তমান সমাজ ভাঙিয়া দিয়া নূতন সমাজ গড়িতে হইবে। সর্বসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছাই হইবে সে সমাজের চালক শক্তি। রুসো ছিলেন চরম গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ; নাগরিকরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ-ভাবে রাষ্ট্রের বিধান প্রণয়ন করিবে—এই ছিল তাঁর মত। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ইঁহাদের রচনা পড়িয়া বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল। যে সব ফরাসী সৈন্য আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়াছিল, মানবের মৌলিক অধিকারের বাণী বহন করিয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।

রুসো

বিপ্লবের সূত্রপাত—বহুদিন ধরিয়া নানা ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমা হইতেছিল। ফ্রান্সের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল মাত্র। অমিত অপব্যয় ও অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহে রাজা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই কোষাগার প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমেরিকাকে অর্থসাহায্য করিতে গিয়া বাকী অর্থও নিঃশেষিত হইল। তখন বাধ্য হইয়া রাজা ষোড়শ লুই অভিজাত, যাজক ও জনসাধারণ এই তিন ভাগে (Estates)

রাজা ষোড়শ লুই

বিভক্ত ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা (States General) আহ্বান করিলেন (১৭৮৯)। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর এই সভাকে আর ডাকা হয় নাই। রাজার উদ্দেশ্য ছিল এই সভার সাহায্যে নূতন কর আদায় করা; কিন্তু ভল্‌টেয়ার ও রুসো কর্তৃক অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ইহার মাধ্যমে দেশের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার সুযোগ পাইল, প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার চাহিল।

রাজা ষোড়শ লুই এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজে ছিলেন উদার, ভদ্র ও মিতব্যয়ী। কিন্তু তাঁহার কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ছিল না। রাণী মেরী আঁতোয়ানেৎ ছিলেন গর্বিত ও বুদ্ধিহীন, রাজভ্রাতাগণ ছিল কাপুরুষ, মন্ত্রী নেকার—দ্বিধাগ্রস্ত। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের প্রতিনিধিরা (Third Estate) যখন অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর সহিত একত্র বসিয়া শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিল, রাজপক্ষ তখন বিষম বিপদে পড়িল। সভাগৃহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন প্রতিনিধিরা এক টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সংবিধান প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা ছাড়াছাড়ি হইবেন না। অভিজাত ও যাজক প্রতিনিধিগণ শেষ পর্যন্ত যুক্ত অধিবেশনে রাজি হইলে প্রতিনিধি-সভা জাতীয় সভায় পরিণত হইল।

মেরী আঁতোয়ানেৎ
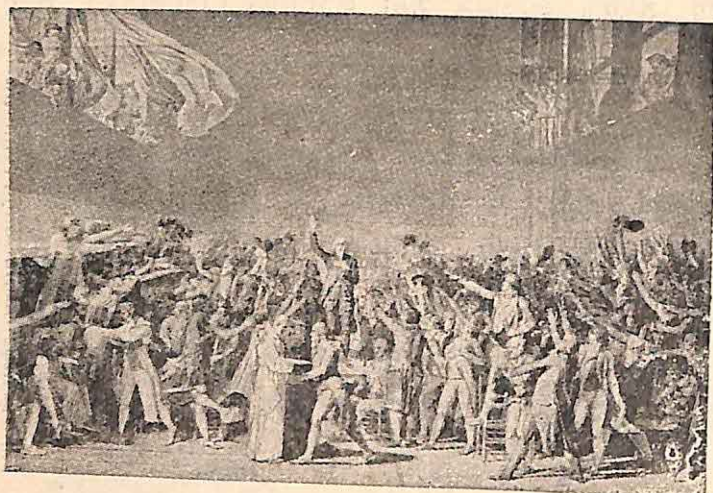
টেনিস মাঠের শপথ

ইতিমধ্যে প্যারিসে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল। রাজা নেকারকে বরখাস্ত করিলে জনসাধারণের ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিলের দুর্গকারা আক্রমণ করিয়া সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিল। ইহাই ফরাসী বিপ্লবের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া আজও ফরাসীরা এই দিনটি জাতীয় দিবস রূপে পালন করে। বাস্তিল-পতনের সংবাদ মফঃস্বলে গেলে কৃষকেরা দলে দলে স্থানীয় ভূস্বামীদের অট্টালিকা আক্রমণ করিল ও জমি-জমা-দেনা সংক্রান্ত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। পাছে রাজা সৈন্য-সামন্ত আনিয়া বিপ্লব দমন করেন সেজন্য জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সৃষ্টি হইল, প্যারিস ও অন্যান্য সহরে 'কম্যুন' নামে স্থানীয় শাসক-সমিতি গঠিত হইল।
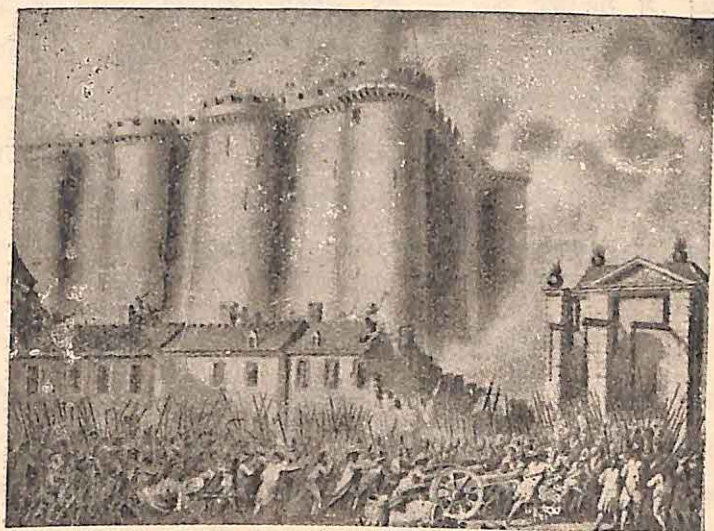
দুর্গকারা বাস্তিলের পতন

সামন্ততন্ত্র লোপ—এদিকে জনসাধারণকে তুষ্ট করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া জাতীয় সভা ৪ঠা আগস্ট সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লোপ করিল। স্থির হইল, চার্চকে আয়ের দশমাংশ (tithe) আর দিতে হইবে না। সকল শ্রেণীকে কর দিতে বাধ্য করা হইল। বিচারালয়ে ও সরকারী চাকুরিতে সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত হইল। নূতন ভূমিবণ্টন নীতির ফলে বহু ছোট ছোট জোতদারের সৃষ্টি হইল। ইহারা স্বার্থের তাগিদে বিপ্লবকে সমর্থন করিতে লাগিল।

মানবাধিকার ঘোষণা—আমেরিকার অনুসরণে মানবাধিকার ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man) করিয়া জাতীয় সভা নূতন সমাজের ভিত্তি নির্দেশ করিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা

হইল সে সমাজের আদর্শ। সব মানুষই আইনের চোখে সমান, প্রত্যেকের সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের, আত্মরক্ষা করিবার ও স্বাধীন এবং সুখী জীবন যাপন করিবার বিধিদত্ত অধিকার আছে—ইহা স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে প্যারিসের বুভুক্ষু জনতা আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়া দিল। ৫ই অক্টোবর তাহারা রাজধানী ভার্সাই অভিমুখে চলিল এবং রাজদরবার ও জাতীয় সভাকে প্যারিসে আসিতে বাধ্য করিল।

চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—সংবিধান রচনা করিতে জাতীয় সভার প্রায় আঠার মাস সময় লাগে। তাহার মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তিত হয়। যথেচ্ছ আটক করা ও নানাবিধ শাস্তি বন্ধ হইল। শাসনের সুবিধার জন্য ফ্রান্সকে আশীটি ভাগে (Department) ভাগ করা হইল। সুবিচার পাওয়া সহজ হইল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চার্চের বিশাল ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং যাজকদের মাহিনা রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হইবে স্থির হইল। স্বল্প আয়ের নিম্নপদস্থ যাজকরা এই ব্যবস্থায় লাভবান হইল বটে, কিন্তু যাজকদের নির্বাচন-ব্যবস্থা রোমান ক্যাথলিক ধর্মের মূলে আঘাত করিল। অনেক ধার্মিক যাজক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইতে রাজি হইল না।

রাজার পলায়ন ও পুনরাগমন—ধর্মভীরু রাজা অনেক দ্বিধার পর এই বিধান অনুমোদন করিতে রাজি হন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সপরিবারে বিদেশে পলায়ন করিবার ফন্দিও আঁটিতে থাকেন। পলাইবার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ধরা পড়েন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্যারিসে ফিরিতে হয়। জাতীয় সভা তাঁহাকে টুইলারিজ প্রাসাদে নজরবন্দী করিয়া রাখে। দেশে সাধারণতন্ত্রী মনোভাব

ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠে। রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের খসড়া অনুমোদন করেন। দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যতম মিরাবো-র মৃত্যু হইলে তাহাদের ক্ষমতা কমিতে থাকে।

বিধান সভা—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে যে নূতন বিধান সভা নির্বাচিত হইল তাহার নেতৃত্ব চরমপন্থী সাধারণতন্ত্রী জ্যাকোবিনদের (Jacobin) হাতে চলিয়া যায়। দেশত্যাগী পলাতক অভিজাতের দল বিদেশীর সাহায্যে বিপ্লবীদের উপর ভয়াবহ প্রতিশোধ লইবে ঘোষণা করিতে থাকিলে বিধান সভা তাহাদের অবিলম্বে ফিরিবার আদেশ দেয়। প্রত্যাবর্তন না করিলে তাহাদের প্রাণদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে বলা হয়। অভিজাতগণ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং রাজতন্ত্র রক্ষার্থ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু তাহারা অগ্রসর হইবার পূর্বেই বিপ্লবী ফ্রান্স বিদেশী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারল।

বিপ্লবী যুদ্ধের আরম্ভ—প্রথম প্রথম সামরিক শিক্ষা ও উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অভাবে বিপ্লবী সৈন্যদল পরাজিত হয়। কিন্তু সদ্যোজাগ্রত দেশাত্মবোধই তাহাদের অপরাজেয় শক্তি যোগাইল। দেশরক্ষার জন্য দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল, মুখে তাহাদের উদ্দীপনাময় বিপ্লবী সঙ্গীত 'লা মার্সাই'। সে গান আজও ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত। নবভাবে অনুপ্রাণিত ফরাসী বাহিনীর সম্মুখে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পেশাদারী সৈন্য হটিতে থাকে। এই সময় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স এক হঠকারিতা করে। দুর্ধর্ষ পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকারী হইলেও ফরাসী নৌবাহিনী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ নৌবলে ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ কেহ ছিল না। ফ্রান্সের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে ইংল্যাণ্ড আঘাত হানিল।

রাজা ও রাণীর প্রাণদণ্ড—বামপন্থী জ্যাকোবিনরা রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী ছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কন্‌ভেন্‌শানের নির্বাচনে এই দল ক্ষমতা লাভ করে। তাহাদের নেতা ছিলেন দাঁতঁ ও রোব্‌স্‌পিয়ার। দেশ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত, ভিতরেও শত্রুর অভাব নাই। তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া কিংবা ভয় দেখাইয়া দমাইয়া
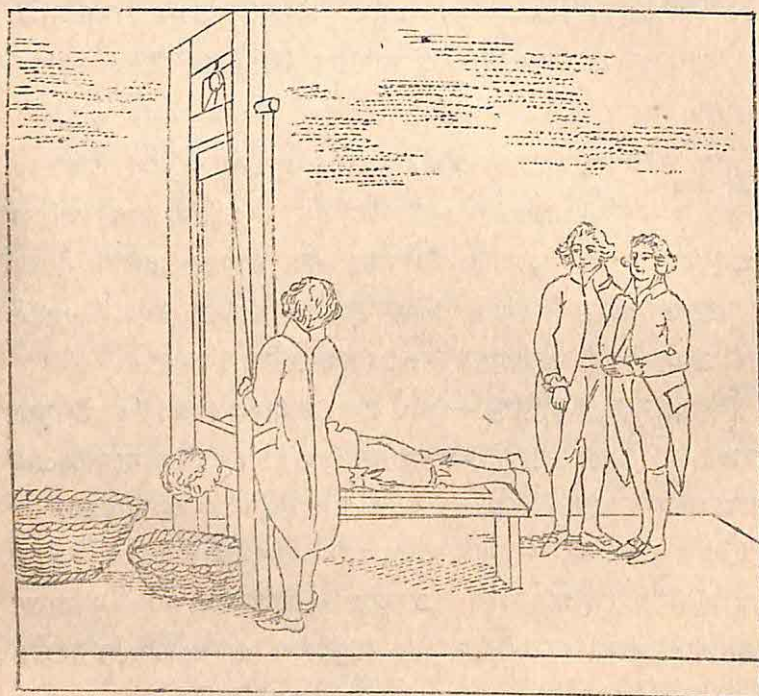
গিলোটিনে শিরশ্ছেদ

রাখিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে কার্য সম্ভব নয়—ইহাই ছিল জ্যাকোবিনদের অভিমত। রাজা জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র-জাল

রচিত হইবে—এই ভয়ে গিলোটিন যন্ত্রে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল (১৭৯৩, ২১ জানুয়ারী)। দেশদ্রোহীদের নিপাত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য এবং দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য সর্বত্র দূত পাঠানো হইল। এইরূপে ত্রাসের রাজত্ব বা 'Reign of Terror' সুরু হইল।

ত্রাসের রাজত্ব—জ্যাকোবিনদের আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজতন্ত্রের অনুকূলে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এদিকে আবার ধর্মযাজকদের প্রতি এই বিপ্লবীরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহাতে গোঁড়া ক্যাথলিক কৃষকরা মোটেই খুসা হয় নাই। তুলোঁ বন্দর ইংরাজ সৈন্যদের আহ্বান করিয়াছিল। তা'ছাড়া যুদ্ধে বার বার ফ্রান্সের পরাজয় হইতেছিল। জ্যাকোবিনরা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ক্রমে আরও কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল। চরমপন্থীদের অপ্রিয় লোক মাত্রই গিলোটিনে নিহত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ অকারণে অনেকে মারা পড়িল। ভার্জিন, মাদাম রোলাঁ প্রভৃতি নরমপন্থী জ্যাকোবিন পর্যন্ত নিহত হইলে দাঁতঁ ও রোব্‌স্‌পিয়ারের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিরোধ বাধিল। ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি উপদল ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ সাম্যবাদ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল, কেহ বা চাহিয়াছিল ধর্মের বিলোপ সাধন করিয়া অখণ্ড যুক্তির রাজত্ব।

রোব্‌স্‌পিয়ার

একটির পর একটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া রোব্‌স্‌পিয়ার চরম ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। দাঁত ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিতেন, কিন্তু রক্তপাতে তাঁহার ঘৃণা ধরিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন রোব্‌স্‌পিয়ারের আর বেশী দিন নাই।

রোব্‌স্‌পিয়ারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, সাহসও যে খুব বেশী ছিল তা নয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া নীতিবাগীশ, আর তাঁর ছিল অসীম আত্মবিশ্বাস। তিনি বিপ্লবকে নিরাপদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্ব ব্যতীত বিপ্লব সফল হইবে না মনে করিতেন। 'পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা' ছিল তাঁহার লক্ষ্য, ধনবৈষম্য দূর করিবার প্রয়াসও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার স্বৈরতন্ত্রের মূল্য দিতে অন্য পক্ষ অস্বীকার করিল। তাঁহার শত্রুরা তাঁহারই আইনে তাঁহাকে বন্দী করিল। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। তাঁহার সঙ্গে 'ত্রাসের রাজত্ব' শেষ হইল (১৭৯৪)।

নরমপন্থীরা এই ভাবে আবার শাসনভার পাইল বটে, কিন্তু কি আভ্যন্তরীণ কি বৈদেশিক নীতি কোনটিই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারিল না। তবে বিপ্লবের বাণীই হইল ফরাসী বাহিনীর সর্বাপেক্ষা শক্তিধর অস্ত্র। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ইতালীতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হইল। ঐ সকল দেশের জনগণ ফরাসী বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের আগমন অনুভব করিল। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিপ্লবের মুখোস পরিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব হইয়াছে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—এই সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। বিপ্লবের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন

সম্রাট-বেশে নেপোলিয়ান

গোলন্দাজ বাহিনীর শিক্ষানবিশ, রোব্‌স্‌পিয়ারের ভক্ত। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের তিনি প্যারিসের অরাজক জনতার হাত হইতে বাঁচান। ইতালীতে তাঁহারই উদ্যম ও নেতৃত্ব-কৌশলে অস্ট্রিয়ার বাহিনী পরাভূত হয়। তাঁহার মত সেনাপতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সমরক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত সাফল্য তাঁহাকে ফরাসী দেশে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। বিপ্লবী শাসকদের অকর্মণ্যতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ফ্রান্সের শাসন-কর্তৃত্ব হস্তগত করিলেন। পরে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হইলেন।

তিনি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে বারংবার পরাজিত করেন এবং প্রায় পনের বৎসরের জন্য ইউরোপে ফরাসী-প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার প্রণীত বিধানাবলী (Civil Code) বিপ্লবের সুফলগুলি রক্ষা করিয়াছিল। ইতালী ও জার্মানীতে তাঁহারই প্রভাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সূচনা হয়। কিন্তু সারা ইউরোপ গ্রাস করিতে উদ্যত হওয়ায় নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি হইল। স্পেনে, রাশিয়ায়, জার্মানীতে তাঁহার বিরাট বাহিনী পরাজিত হইল। ফরাসী বিপ্লবের বাণী এই সকল দেশের জনগণকে ফরাসী-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সমবেত শক্তি নেপোলিয়ানের পতন ঘটাইল। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে শেষ পরাজয়ের পর তিনি বন্দী ভাবে সুদূর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে প্রেরিত হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সেইখানেই এই অদ্ভুতকর্মা বীরের মৃত্যু হইল। ফ্রান্সে পুরাতন রাজবংশ আবার ফিরাইয়া আনা হইল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল—ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ফরাসী বিপ্লবের ফলে স্বৈরতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীর অধিকারের উপর স্থাপিত প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার অন্ত

আসন্ন হইল। বিপ্লবী আদর্শ নূতন সমাজ সৃষ্টি করিল। যদিও ফ্রান্সে বিপ্লব সুরু হয়, তথাপি বিপ্লবের কারণগুলি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান ছিল। সেইজন্য সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর একটা দেশকালাতীত আবেদন ছিল। শীঘ্রই অন্যান্য দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসকে নানাদিক দিয়া প্রভাবিত করে। আজিকার পৃথিবীতে দেশে দেশে গণতন্ত্রের যে আদর্শ জয়ী হইয়াছে, তাহার মূল উৎস ফরাসী বিপ্লব।

খ্রীষ্টাব্দ

—১৭৮৯ মে ফ্রান্সে প্রতিনিধি সভা আহ্বান
—" জুন টেনিস মাঠের শপথ
—" জুলাই বাস্তিলের পতন
—" আগস্ট সামন্ততন্ত্রের বিলোপ : মানবিক অধিকারের ঘোষণা
—১৭৯২ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
—" আগস্ট রাজতন্ত্রের পতন
—১৭৯৩ জানুয়ারী রাজার প্রাণদণ্ড
—" ফেব্রুয়ারী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
—১৭৯৪ এপ্রিল দাঁতঁর দলের প্রাণদণ্ড
—" জুলাই রোব্‌স্‌পিয়ারের প্রাণদণ্ড
—১৭৯৯ নেপোলিয়ানের ক্ষমতা লাভ
—১৮০৪ নেপোলিয়ানের সম্রাট পদ গ্রহণ
—১৮১৪-১৫ নেপোলিয়ানের পতন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিল্প-বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সভ্যতাকে নূতন রূপ দিয়াছিল ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প-বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মত আকস্মিক বা নাটকীয় ঘটনাবলীর সংযোগ নহে, কিন্তু ইহা ধীরগতিতে অগ্রসর হইয়া মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজগঠন নানা ভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের উৎপত্তি হয় ইংল্যাণ্ডে, পরে ইহা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের রূপ—১৭৬০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে যাহার ফলে কৃষি-প্রধান ইংল্যাণ্ড শিল্প-প্রধান ইংল্যাণ্ডে পরিণত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সব জমি গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া চাষবাস করিত সেগুলিকে এখন বেড়া দিয়া ঘেরাও করিয়া জমিদারের খাস-সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। ছোট ছোট গ্রাম জনবহুল সহরে রূপান্তরিত হয়। গীর্জার চূড়া ছাপাইয়া উঠে কারখানার চিমনির সারি। বড় বড় পাকা রাস্তা তৈয়ারী হয়, নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিবার জন্য বাষ্পীয় পোত নির্মিত হয়, দেশের সর্বত্র রেলপথ বিস্তৃত হয়। নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কারে ও বাষ্পীয় শক্তি নিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বিস্ময়করভাবে বাড়িয়া যায়; লৌহ-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, পাত্র-শিল্প প্রভৃাত নূতন নূতন যন্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠে।

ল্যাঙ্কাসায়ার, মিড্‌ল্যাণ্ডস্‌ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি এই কারণে দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। কারখানায় কাজ করিবার জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে শ্রমিক আসিতে থাকে এবং তাহাদের বসবাস, শিক্ষা প্রভৃতির সুব্যবস্থা না হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং সাম্রাজ্য-বিস্তার অনিবার্য হইয়া উঠে।

এই সব পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে নাই, দীর্ঘ দিন ধরিয়া বহুলোকের চেষ্টার ফলে ঘটিয়াছে। মানব-জীবনকে নানা দিক দিয়া গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে শিল্প-বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফল বাস্তবিকই বৈপ্লবিক। এই যন্ত্র-বিপ্লব ইংল্যাণ্ড হইতে সুরু হইলেও পরে শুধু ইউরোপে নয় পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল।

ধনতন্ত্র—ষোড়শ শতাব্দী হইতে সুরু করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ শোষণের ফলে এক শ্রেণীর লোক প্রচুর লাভ করিতেছিল। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে ধনবৃদ্ধির সুবিধা বাড়ে। সেই সঞ্চিত মুনাফা শিল্প-বিপ্লবে মূলধনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পূর্বে কুটীর শিল্পের জন্য সামান্য মূলধনের প্রয়োজন হইত, শিল্পীরা নিজেরাই তাহা যোগাইত। তাহারা স্বগৃহে বসিয়া নিজেদের যন্ত্রপাতি ও শ্রম দিয়া জিনিস তৈয়ারী করিয়া নিজেরাই বাজারে বেচিত। পরে এক শ্রেণীর দালালের উদ্ভব হইল। তাহারা শিল্পীদের কাজ যোগাইত, কাঁচামাল সরবরাহ করিত, অনেক সময় যন্ত্রপাতিও ভাড়া দিত, তারপর শিল্পীদের উৎপন্ন জিনিস বাজারে বেচিয়া লভ্যাংশ নিজেরাই রাখিত। এইভাবে শিল্পীদের স্বাধীনতা অনেকটা নষ্ট হয়।

ক্রমে এই অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটিল। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়িল, আর সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য নূতন নূতন কলকব্জা আবিষ্কৃত হইল যাহার সাহায্যে অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে বেশী জিনিস উৎপাদন করা যায়। কুটীর শিল্পের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া যন্ত্রশিল্পের স্থান প্রসারিত হইল। উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে যখন বিরাট বিরাট দামী যন্ত্র বসাইতে হইল, অনেক কাঁচামাল কিনিতে হইল এবং সেগুলি ঠিক মত কাজে লাগাইবার জন্য কারখানার বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োজন হইল, তখন ছোট ছোট শিল্পীরা সামান্য মূলধন ও সঙ্কীর্ণ কুটীরে কুলাইল না। ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিল, বিশাল কারখানা নির্মাণ করিল। শ্রমিকদের ফ্যাক্টরীতে আসিয়া কাজ করিতে হইল। লোকসংখ্যা বাড়ায় এবং কৃষিক্ষেত্র কমিতে থাকায় শ্রমিক পাওয়া সহজ হইল। আত্মকর্তৃত্ব হারাইয়া শিল্পীরা কারখানা মালিকের দাসে পরিণত হইল। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে সৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হইল, কাজ হইল বিরক্তিকর ও একঘেয়ে। প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী কমিয়া গেল। বাজারের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে মালিকেরা শ্রমিকদের ইচ্ছামত নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিল। উৎপাদনের এই নূতন ব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। মুনাফাই ছিল ইহার পরম লক্ষ্য।

বস্ত্রশিল্প—শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড বিজ্ঞানে খুব উন্নতি করে। দেশে এমন একটি বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া গড়িয়া উঠে যাহা নূতন নূতন আবিষ্কারের সহায়তা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পশম শিল্পই ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রধান শিল্প। ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের অনুকরণে বস্ত্র তৈয়ারী করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সস্তায় উৎকৃষ্ট ও

মিহি কাপড় তৈয়ারী করা সম্ভব হয় নাই। হঠাৎ পর পর কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রশিল্পের আশ্চর্য উন্নতি ঘটিল। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন কে উড়ন্ত মাকু (Flying shuttle) বাহির করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেমস হারগ্রিভস আবিষ্কার করেন স্পিনিং জেনী (Spinning Jenny) ; ইহাতে এক সঙ্গে আটগাছি সূতা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু সে সূতা নরম ছিল বলিয়া শুধু পোড়েনের কাজে লাগিত। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্করাইট ওয়াটার-ফ্রেম (Water-frame) বাহির করেন যাহা দ্বারা শক্ত সূতা তৈয়ারী হইল। এই ফ্রেম চালাইবার জন্য জলশক্তি প্রয়োগ করিতে হইল এবং স্রোতবতী নদীর ধারে কারখানা গড়িতে হইল। জেনী এবং ওয়াটার-ফ্রেম মিশাইয়া স্যামুয়েল ক্রম্পটন মিউল (Mule) নামক যন্ত্র তৈয়ারী করিলেন। তাহাতে শক্ত, সরু ও সমান সূতা প্রস্তুত হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এডমাণ্ড কার্টরাইট শক্তি-চালিত তাঁত (power-loom) আবিষ্কার করেন। জেমস ওয়াট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সূতা-কলে ইহার প্রথম ব্যবহার হয়। ইহা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। জল-শক্তির বদলে বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন শতগুণে বাড়িয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সহিত ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড়ের কল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল।

জেমস্ ওয়াট

লৌহশিল্প—ইতিপূর্বে খনি হইতে কয়লা তোলা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এখন লোহার খাঁচা বসাইয়া খনির গভীরতর প্রদেশে নামা ও কাজ করা সম্ভব হইল। বৈজ্ঞানিক ডেভি এক রকম বাতি আবিষ্কার করিলেন যাহাতে মাটির নীচে খনি-মজুরের নিরাপত্তা বাড়িল। পাথুরে কয়লা সস্তা হওয়ায় লৌহ শিল্পের অনেক উন্নতি হয়। কয়লা পোড়াইয়া লোহা গালানোর কাজ সুরু হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ট লোহা গালানোর এক নূতন প্রক্রিয়া বাহির করিলেন। তাহার ফলে লোহার উৎপাদন খুব বাড়িয়া গেল। বাড়ীঘর, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ
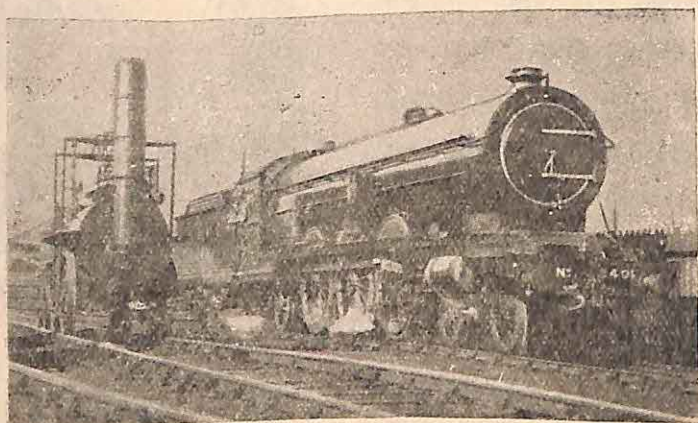
বামে—ষ্টীফেনসন-উদ্ভাবিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত ট্রেন
দক্ষিণে—এ-কালের একটি ট্রেন-ইঞ্জিন

করিতে কাঠ ও পাথরের বদলে লোহা লাগান হইল। রেলপথ, ইঞ্জিন ও নানা রকমের যন্ত্র নির্মাণের তাগিদে লোহার চাহিদা অসম্ভব বাড়িল।

যানবাহন—শুধু উৎপাদন বাড়িলেই সমস্যার শেষ হয় না। উদ্বৃত্ত পণ্য চলাচলের জন্য উন্নত পথঘাট ও যানবাহন চাই। ১৮১১

খ্রীষ্টাব্দে জন ম্যাকাডাম পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিয়া উন্নতির পথ দেখাইলেন। ব্রিণ্ডলে খাল কাটিয়া সমুদ্র বা নদীর সহিত দেশের অভ্যন্তরস্থ নগরগুলির যোগ সাধন করিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ স্টীফেনসন উদ্ভাবন করিলেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত ট্রেন। বাষ্পীয় জাহাজের প্রচলন হইল। বাহির হইতে কাঁচামাল ও খাদ্য সস্তায় আনা গেল, বিদেশে পাঠান গেল তৈয়ারী মাল।

জর্জ স্টীফেনসন
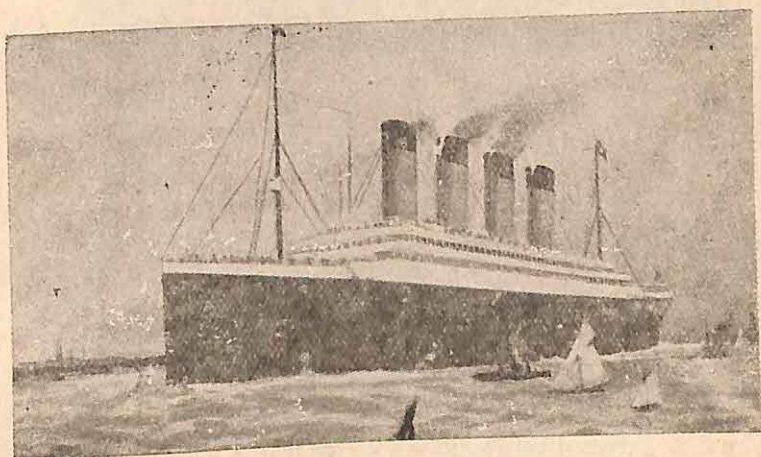
আধুনিক কালের বাষ্পীয় জাহাজ
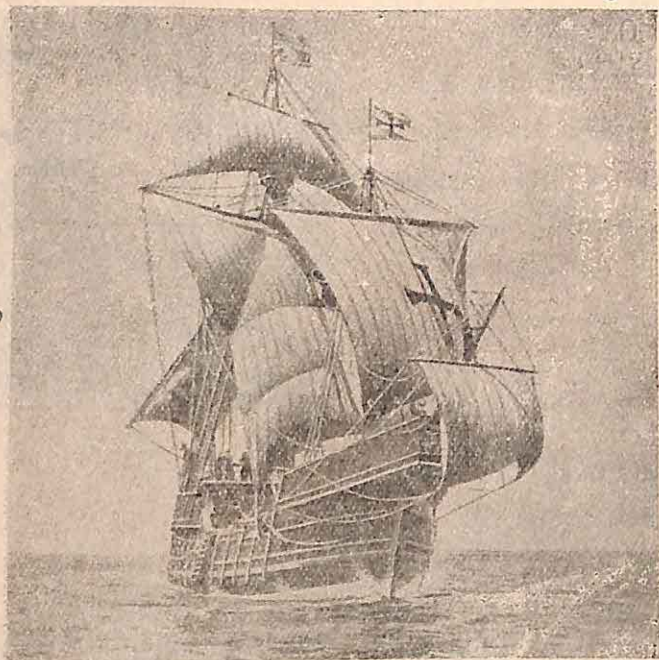
সেকালের পালতোলা জাহাজ

কৃষি—শুধু শিল্পে নয়, কৃষিতেও প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। জলাভূমির জল নিকাশ করিয়া, পতিত জমি আবাদযোগ্য করিয়া, ভাল সার ও লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া, বিভিন্ন ফসলের চাষ করিয়া উৎপাদন বাড়ানো হইল। শিক্ষিত জমিদারগণ এ বিষয়ে খুব অগ্রণী হন। উন্নত ধরণের গাজর ফলানোর জন্য টাউনসেণ্ড্‌কে 'গাজর টাউনসেণ্ড্' (Turnip Townshend) বলা হইত। নানাদিকে কৃষির উন্নতি হইল বটে, কিন্তু এজন্য বহু প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইল। তাহারা হয় স্বত্ব

বিসর্জন দিয়া জমি বন্দোবস্ত লইল, না হয় গ্রাম ছাড়িয়া কারখানার মজুর হইল।

শিল্প-বিপ্লবের ফল—শিল্প-বিপ্লবের ফলে পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া গেল, প্রচুর ধন সঞ্চিত হইল। কিন্তু এই লাভ গ্রাস করিল সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ। সাধারণ মানুষ নূতন সুখ-সুবিধার অংশ পাইল না। কারণ, সদ্যোজাত কারখানা-ব্যবস্থার (Factory System) নানা দোষও ছিল। ইহার ফলে শিল্পপ্রধান অঞ্চলে লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িতে সুরু করে। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য কোন সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় তাহাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা বস্তির মধ্যে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে হয়। এই পশুজীবন যাপন করিতে গিয়া তাহাদের চরিত্রের অধঃপতন হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং নারীরাও কারখানার কাজে লাগিয়া যায়। তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হইত যৎসামান্য, অথচ কাজ করিতে হইত বার চৌদ্দ ঘণ্টা। কারখানা আইন করিয়া এইসব দোষ দূর করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যন্ত্রের বহুল ব্যবহার বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করে এবং বেকার শ্রমিকদল যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে থাকে। ইহার নাম লাডাইট বিদ্রোহ (Luddite Revolt)। পরে তাহারা বুঝিতে পারে, এ উপায়ে ধনতন্ত্রের সমস্যা সমাধান করা যায় না। তখন সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারা রাষ্ট্রের শক্তি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। তবে জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি আগেকার অপেক্ষা ভাল হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের হয় প্রভূত ধনবৃদ্ধি। বৃহৎ সাম্রাজ্যে মাল বেচিয়া ইংল্যাণ্ড আপনার আর্থিক শক্তিকে আরও দৃঢ় করিল। সমস্ত ইউরোপে তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। ক্রমশঃ অন্যান্য দেশও শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। প্রকৃতির

উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া মানুষ জীবনযাত্রার মান অনেকখানি উন্নত করিল। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষও এই উন্নাতর খানিকটা অংশ পাইল। বর্তমানে সমাজতন্ত্রের আদর্শ শিল্প-বিপ্লবের ফলে গঠিত সমাজকে নব নব কল্যাণের পথে লইয়া যাইতেছে।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৭৩৩ উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার
—১৭৬৫ হারগ্রিভসের স্পিনিং জেনী
—১৭৬৭ আর্করাইটের ওয়াটার-ফ্রেম
—১৭৬৯ জেমস্ ওয়াট-এর বাষ্পীয় ইঞ্জিন
—১৭৮৪ কার্টের লোহা গালাইবার পদ্ধতি
—১৭৮৫ কার্টরাইটের শক্তি-চালিত তাঁত
—১৮১১ ম্যাকাডামের পাকা রাস্তা
—১৮১৪ স্টীফেনসনের ট্রেন-ইঞ্জিন

নবম পরিচ্ছেদ

ইতালী ও জার্মানীর ঐক্যসাধন

জাতীয় চেতনার উদ্বোধন—ফরাসী বিপ্লবের উদার আদর্শ ইউরোপের চিত্তে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। প্রত্যেক জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য গণতান্ত্রিক আত্মশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবী করিতেছিল। এই নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার অনুপ্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ইতালী ও

জার্মানী দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উভয় ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের অভিযানের ফলে ঐক্যবোধ উদ্বোধিত হইয়াছিল।

ভিয়েনা সম্মেলন—ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইতালী কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ছিল অস্ট্রিয়ার অধীন; টাস্কানি, পার্মা ও মডেনা অস্ট্রিয়ার অনুগত। ভেনিস ছিল স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। নেপলস ও সিসিলিতে স্পেনের বুর্বোঁ রাজবংশের এক শাখা রাজত্ব করিত্। মধ্য ইতালী ছিল পোপের অধীন। নেপোলিয়ানের আক্রমণে অস্ট্রিয়া ও বুর্বোঁ বংশের শক্তি বিপর্যস্ত হয়। ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে একই শাসন-পদ্ধতি, আইন ও উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

এখানেই ইতালীর শিশু জাতীয়তাবাদের হাতে খড়ি। কিন্তু ফরাসী বাহিনী ইতালী ত্যাগ করা মাত্র ভেদবুদ্ধি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের পতনের পর স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়া আসিল। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন বিদেশী অস্ট্রিয়া ও স্বেচ্ছাচারী বুর্বোঁ বংশের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করিল। রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইল ও প্রজাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল বিষম করভার। অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেটারনিক্ উপহাস করিয়া বলিলেন—ইতালা একটা জাতি নয়, ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র।

মাৎসিনি—প্রকাশ্যে রাজনীতি চর্চা বন্ধ হওয়ায় ইতালীর দেশ-প্রেমিকগন গোপন সমিতি গড়িয়া তুলিল। তাহাদের প্রধান নেতা মাৎসিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বলিলেন—যখন অত্যাচার চরমে ওঠে ও সত্যের কণ্ঠরোধ করে তখন হয় ফাঁসিকাঠে প্রাণ উৎসর্গ কর, আর না হয় অত্যাচারীকে সবলে ধ্বংস কর। এই উদ্দেশ্যে নেপ্‌ল্‌সে 'কার্বনারি' নামক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। একবার সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা

হইলে অস্ট্রিয়ার সৈন্য বিপ্লবীদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। জাতীয়তাবাদীরা বুঝিতে পারিল ইতালী হইতে স্বৈরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক অস্ট্রিয়াকে তাড়াইতে না পারিলে জাতীয় ঐক্য স্থাপন ও শাসন-পদ্ধতির সংস্কার অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতের ঐক্য ছিল না। এক দল বলিল সমগ্র ইতালী সম্মিলিত করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে, দ্বিতীয় দল চাহিল যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় দল পিয়েডমণ্টের রাজবংশের অধীনে ইতালীকে মিলিত করিতে চাহিল।

মাৎসিনি প্রথম দলের নেতা এবং ইতালীর জাতীয়তাবাদের পুরোহিত। দেশই ছিল তাঁহার কাছে ধ্যান, জ্ঞান, জপ-মন্ত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি যুব ইতালী দলের (Young Italy Party) সৃষ্টি করেন। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, ভাবের আবেগ ও ভাষার ওজস্বিতা এমন মোহ বিস্তার করে যে ইতালীর জনসাধারণ এক নূতন ঐক্যের বন্ধন অনুভব করিতে থাকে। সে ঐক্য শুধু বাহিরের নয়। একই ভাষার অমৃত পান করিয়া, একই গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া, একই বিদেশী শত্রুদের হাতে নির্যাতিত হইয়া মর্মে মর্মে লোকে তাঁহার বাণীর প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল।

মাৎসিনি

১৮৪৮-এর বিপ্লব—কিন্তু দেশপ্রেমের উন্মাদনা এক কথা, তাহাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা আর এক কথা। তার জন্য চাই নিপুণ সংগঠন, সামরিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। প্রথম দুটির অভাব পূরণ করেন গ্যারিবল্‌ডি, শেষেরটির—কাভুর। ১৮৪৬ ও ১৮৪৮-এর মধ্যে ইতালীর উপর দিয়া বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গেল। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলি সাময়িকভাবে একে একে নিয়মতন্ত্র মানিতে বাধ্য হইল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াতেও বিপ্লব ঘটে, মন্ত্রী মেটারনিকের পতন হয়। ইহাতে ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের খানিকটা সাময়িক সুবিধা হইল, কিন্তু শীঘ্রই অষ্ট্রিয়া আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া ইতালীতে বিপ্লব দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইল। পোপ রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন। মাৎসিনির নেতৃত্বে রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ফ্রান্স পোপের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইলে বিপ্লবীদিগকে রোম ত্যাগ করিতে হইল। আপাততঃ বিপ্লব ব্যর্থ হইল, ইতালীতে ঐক্য ও স্বাধীনতা আসিল না।

কাভুর—ইতালীর এই দুর্দিনে পিয়েডমণ্টের কর্ণধার হইলেন কাভুর (১৮৫২)। প্রথম হইতে তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, একা পিয়েডমণ্টের শক্তিতে কুলাইবে না, অষ্ট্রিয়ার সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে এবং অন্ততঃ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে দলে টানিতে হইবে। কাভুরের মত কূটনীতিজ্ঞ দুর্লভ ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ করিলেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান গোপনে কাভুরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অষ্ট্রিয়া পিয়েডমণ্ট আক্রমণ করিয়া সম্মিলিত ফরাসী ও ইতালীয় বাহিনী কর্তৃক পরাস্ত হইল।

কিন্তু সাফল্যের মুখে আর এক বাধা আসিল। রোম পোপের হস্তচ্যুত হইয়া পিয়েডমণ্টের অধীন হইলে ফ্রান্সের ক্যাথলিক প্রজারা ক্ষুব্ধ হইবে ভাবিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ান সহসা অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। ইতালীর জনগণ তাহাতে বিচলিত হইল না। গণভোটের দ্বারা মধ্য ইতালীর সমস্ত রাষ্ট্র পিয়েডমণ্টের সঙ্গে যোগ দিল। বাকী রহিল নেপলস, সিসিলি ও রোম।

কাভুর

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ইতালীর অন্যতম জননায়ক বীরশ্রেষ্ঠ গ্যারিবল্‌ডি সিসিলি ও নেপলসে অবতরণ করিলেন। বুর্‌বোঁ রাজবংশের পতন হইল। কিন্তু কাভুরের ভয় হইল—ইহাতে মাৎসিনির সাধারণতন্ত্রী দল লাভবান হইবে; পিয়েডমণ্টের রাজবংশের অধীনে তিনি যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইবে। বিশেষতঃ গ্যারিবল্‌ডি রোম অধিকার করিয়া পোপকে তাড়াইয়া দিলে অন্যান্য ক্যাথলিক রাষ্ট্র খুসী হইবে না। রোমে পোপের রাজত্ব মানিয়া লইয়া পিয়েডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল নেপলসে উপস্থিত হইলে গ্যারিবল্‌ডি তাঁহার হস্তে নেপলস ও সিসিলি অর্পণ করিলেন। দক্ষিণ ইতালী উত্তরের সঙ্গে এক রাজ্যে যুক্ত হইল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় ইতালী ভেনিস দখল করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের

সময় ফরাসী বাহিনী রোম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন রোমও পিয়েডমণ্টের সহিত যুক্ত হয়। এইরূপে মাৎসিনির জ্বলন্ত দেশপ্রেম, কাভুরের বিচক্ষণ কূটনীতি ও গ্যারিবল্ডির নিঃস্বার্থ বীর্য ইতালীর সংহতি আনয়ন করে।

গ্যারিবল্ডি

জার্মানীর অনৈক্য— জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূলেও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানীতে ছিল প্রায় তিনশত ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র। সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যতঃ তাহারা ছিল স্বাধীন। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশ পুরুষানুক্রমে সম্রাট পদ লাভ করিত। অথচ সামরিক শক্তির দিক দিয়া প্রাশিয়ার সমকক্ষ কেহ ছিল না। জার্মান রাষ্ট্রগুলির একমাত্র যোগসূত্র ছিল প্রতিনিধি সভা বা ডায়েট (Diet)। কিন্তু ইহার সভ্যরা সমগ্র জার্মানীর প্রতিনিধি ছিল না—তাহারা আপন আপন রাজার স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকিত। নেপোলিয়ান জার্মানীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাজান—তার ফলে জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা কমিয়া উনচল্লিশে দাঁড়ায়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং ফ্রান্সের অধীনে একটি সংযুক্ত জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ভবিষ্যৎ জাতীয় ঐক্যের পথ অনেকটা

পরিষ্কার হইল। কিন্তু নেপোলিয়ানের স্বৈরতন্ত্র শীঘ্রই জাতীয়তা-বাদীদের বিদ্রোহী করিয়া তোলে। তাহারা ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহারা কৃতসংকল্প হইল।

মেটারনিকের দমননীতি—দুর্ভাগ্যের বিষয় নেপোলিয়ানের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলন জার্মানীর জন্য যে ব্যবস্থা করিল তাহাতে প্রতিক্রিয়া ও বিভেদের জয় হইল। জার্মানীতে এক নূতন রাজ্যসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহার নেতৃত্ব দেওয়া হইল অস্ট্রিয়াকে। নেপোলিয়ানকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া জার্মানী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় চেতনা উচ্চশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে নাই। সংস্কারকদের মধ্যেও মত ও পথ লইয়া বিরোধ বাধে। কেহ সামন্ততন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে চাহিল, কেহ বা ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহিল। প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই সব আন্দোলন ও আলোচনা চলিত। অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেটারনিক শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলেন। স্বাধীন মত প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইল। এতদ্ব্যতীত প্রাশিয়ার সামরিক ঐতিহ্য ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সংস্কারের প্রতিকূল ছিল। ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংস্কারের চেষ্টা হইলেও অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রে তাহা ব্যর্থ হয়। শুধু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি শুল্ক সংঘ (Zollverein) গঠিত হয়, তাহাতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অনেক বাড়ে এবং জাতীয় চেতনা শক্তিশালী হয়।

১৮৪৮-এর বিপ্লব—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া

ও ইতালীতে বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবে মেটারনিকের পতন হয়। উদার মতবাদের নেতারা ফ্রাঙ্কফার্ট সহরে সমবেত হইয়া জার্মানীর ঐক্য সাধন ও গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার চেষ্টা করে। ফ্রাঙ্কফার্ট সম্মেলন সফল হইলে জার্মানীর ইতিহাস ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। কিন্তু প্রথম হইতেই দেখা গেল প্রতিনিধি নির্বাচনে ভুল হইয়াছে। দূরদৃষ্টি, সৎসাহস ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কোন নেতারই ছিল না। কতকগুলি অবাস্তব মতামত লইয়া তাহারা শুধু অসার তর্ক-বিতর্কে সময় কাটাইল। স্থির হইল যে জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে কোন অ-জার্মান জাতি প্রবেশ করিতে পারিবে না। অস্ট্রিয়া ইহাতে আপত্তি জানাইলে অস্ট্রিয়াকে বাদ দেওয়া হইল। প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান করা হইল জার্মানীর সম্রাট হইতে। ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কফার্ট সম্মেলনের মত কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহিলেন না। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে কলহ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। অতএব তিনি সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফার্টের সংবিধান নাকচ করিয়া দিলেন এবং মনের মত এক যুক্তরাষ্ট্র (federal state) গঠনের প্রস্তাব আনিলেন। জার্মানীর নেতৃত্ব প্রাশিয়ার হাতে চলিয়া যায় দেখিয়া অস্ট্রিয়া ইহাতেও আপত্তি করিল। এইভাবে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যায়।

বিসমার্ক—প্রাশিয়ার অধীনে জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে মিলিত করিতে গেলে অস্ট্রিয়াকে সরান দরকার। তার জন্য প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন প্রয়োজন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম সেদিকে দৃষ্টি দেন। উদারতন্ত্রী নেতারা খরচের ভয়ে ইহাতে আপত্তি করিলে বিসমার্ককে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয় (১৮৬২)। বিসমার্ক চিরদিনই রাজতন্ত্রের সমর্থক। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় তিনি

রাজাকে দমননীতি প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। জার্মানীর জাতীয় ঐক্য তাঁহারও লক্ষ্য ছিল—তবে পন্থা ছিল ভিন্ন। সে পন্থাকে বলা হয় রক্ত ও লৌহের নীতি (Policy of Blood and Iron)। তাহার মূল কথা—প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন। যুদ্ধ ব্যতীত প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মানিতে কোন জার্মান রাষ্ট্র রাজি হইবে না, অস্ট্রিয়া ত নহেই। অতএব বিসমার্ক তাঁহার অসামান্য কূটনৈতিক প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও উদ্যম যুদ্ধ দ্বারা প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ

বিসমার্ক (দক্ষিণে) ও সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান

করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিলেন। পরবর্তী পঁচিশ বৎসর তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার কর্ণধার এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার পরিকল্পনা সফল হইয়াছিল। জার্মান জাতির গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই বটে, কিন্তু পরিবর্তে দিয়াছিলেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ, ঐক্যের শক্তি, প্রভুত্বের গৌরব।

তিনি প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিলেন, তারপর অতি কৌশলে রাশিয়াকে অস্ট্রিয়ার পক্ষ হইতে সরাইয়া আনিলেন। শ্লেস্‌উইগ ও হলস্টিন নামক দুটি প্রদেশ লইয়া স্যাডোয়ায় অস্ট্রিয়ার সহিত যে যুদ্ধ হইল (১৮৬৬) তাহাতে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব যে-সব জার্মান রাষ্ট্র মানিয়া চলিত তাহাদেরও অনেকে পরাজিত হইল। উত্তর জার্মানীর রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল—অস্ট্রিয়া তাহা হইতে বিতাড়িত হইল। দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলি তখনই প্রাশিয়ার সহিত যোগ দিল না বটে, তবে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের ভয়ে বিসমার্কের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বিসমার্কের নীতির দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে দুর্বল ও বিভক্ত করিয়া রাখা। একমাত্র এই উপায়ে তিনি রাইন নদীর পূর্বপারে আপন প্রভাব রক্ষা করিতে পারিতেন। অস্ট্রিয়ার পরাজয়েও তাঁহার চৈতন্য হইল না। বিসমার্ক ভাবিলেন, নেপোলিয়ানকে দিয়া কোন রকমে জার্মানী আক্রমণ করাইতে পারিলে দেশে প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জাগিবে এবং দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিও উত্তরের মত প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। হইলও তাহাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডান ও মেজের যুদ্ধে ফ্রান্স হারিল। সন্ধির ফলে প্রাশিয়া ফ্রান্সের হাত হইতে পাইল অ্যালসেস ও লোরেন, আর দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলি উত্তর জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিল। জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সাধিত হইল, প্রাশিয়ার প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী প্রাশিয়ার রাজা জার্মানীর সম্রাট রূপে স্বীকৃত হইলেন। তবে এই কূটনীতির পথে ঐক্য লাভ করিতে গিয়া

জার্মানীকে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বপ্ন বিসর্জন দিতে এবং জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়াকে দূরে রাখিতে হয়। প্রাশিয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে আসিল প্রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং প্রাশিয়ার সামরিক আদর্শ। রাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টা সাম্রাজ্য-বিস্তারে কেন্দ্রীভূত হইল। প্রতিপত্তিশালী জমিদার এবং সমর বিভাগের কর্তাদের রক্ষণশীল মনোভাব সমস্ত উদার-নৈতিক সংস্কারের পথ বন্ধ করিয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আমেরিকায় দাসপ্রথার উচ্ছেদ

আমেরিকায় দাসপ্রথার সূত্রপাত—দাসপ্রথা অতি প্রাচীন। মনুষ্য সমাজের আদি হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। এক সময় প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা দাসশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় মধ্যযুগে দাসপ্রথা ক্রমশঃ ইউরোপ হইতে লুপ্ত হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে যখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ স্থাপন সুরু হইল তখন আখের ও তামাকের আবাদে বা খনিতে কাজ করিবার জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইল। সেই সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউরোপীয় শ্রমিকেরা বেশীক্ষণ কোন কষ্টকর কাজ করিতে পারিত না। তাহাদের ভরণপোষণ ও মজুরীর ব্যয় পড়িত খুব বেশী। এই অবস্থা দাসশ্রম নিয়োগের অনুকূল ছিল। তাই একদল শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী আফ্রিকার উপকূল হইতে নিগ্রো অধিবাসীদের ভুলাইয়া বা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া আমেরিকায় বেচিত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে কার্পাস চাষ বিস্তার লাভ করিলে দাসের চাহিদা আরও বাড়ে। ক্রমে ঐ অঞ্চলের অথ নৈতিক ব্যবস্থা দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

দাসদের দুঃখ—দাসদের দুঃখের সীমা ছিল না। আফ্রিকা হইতে আমেরিকার পথে পায়ে শিকল ও হাতে বেড়ী বাঁধিয়া গাদাগাদি করিয়া ছোট ছোট জাহাজের খোলে দাসদের পোরা হইত। খাদ্য জুটিত না বলিলেই হয়; কথায় কথায় পিঠে পড়িত

যেত। অনেকেই জাহাজে মারা পড়িত, আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছিত না। আমেরিকায় দাসদের বেচাকেনার জন্য বাজার ছিল। সেখানে গরু-ভেড়ার মত তাহাদের বেচা হইত। তারপর তুলা বা তামাকের আবাদে নিষ্ঠুর মনিবদের ও কর্মচারীদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহাদের জীবন কাটিত।

টমকাকার কুটীর—মিস হ্যারিয়েট বীচার স্টো আমেরিকার নিগ্রো দাসদের এই হৃদয়বিদারক দুর্দশার কাহিনী লইয়া 'টমকাকার কুটীর' নামে এক উপন্যাস লেখেন। টমের মনিব যে খুব খারাপ লোক ছিলেন তাহা নয়। অনেক সময় মনিব বা মনিব-গৃহিণী দয়া দেখাইতেন, দাসদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখিতেন, অসুখে বিসুখে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন, পালা-পরবে উপহার দিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহারা জমিদারীতে থাকিতেন না; তখন পরিদর্শনের ভার পড়িত সাইমন লেগ্রীর মত নর-রাক্ষস কর্মচারীদের উপর। সে দাসদের উদয়াস্ত খাটাইত, ছল করিয়া কাজের ত্রুটি ধরিয়া শাস্তি দিত, মাঝে মাঝে অত্যাচার করিতে করিতে মারিয়াও ফেলিত। সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে দাসদের পিছনে শিকারী কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হইত। সন্তানদের উপর দাসদের কোন অধিকার থাকিত না। স্বামীর কাছ হইতে স্ত্রীকে, পিতামাতার কাছ হইতে সন্তানকে কাড়িয়া লইয়া বেচিয়া দেওয়া হইত। বার্ধক্যে শ্রম-ক্ষমতা কমিয়া গেলে তাহাদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইউরোপে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ডে দাস ব্যবসায় রহিত হয়। আমেরিকাতেও দাস ব্যবসায় বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে যে সকল দাস ছিল তাহারা

এবং পুরুষানুক্রমে তাহাদের সন্তান-সন্ততি দাস হইয়াই থাকিতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরার্ধে দাস ছিল না বলিলেও চলে। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি প্রধানতঃ শিল্প-নির্ভর ছিল। এই অঞ্চল হইতেই দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন আরম্ভ হয়, উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসনের নেতৃত্বে। কিন্তু কৃষি-নির্ভর দক্ষিণার্ধের রাষ্ট্রগুলির দাস ছাড়া চলিত না। সেখানে তুলার চাষ যত বাড়িতেছিল তত দাসের চাহিদা বাড়িতেছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই সব রাষ্ট্রে পৃথিবীর আট ভাগের সাত ভাগ তুলা উৎপন্ন হইত। অতএব তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যে-কোন উপায়ে দাসপ্রথার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। তুলার চাষে জমির উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত নষ্ট হইত, নিত্য নূতন জমির দরকার হইত। নূতন জমি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে ছাড়া মিলিবে কোথায়? তাই দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমের নূতন রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে চাহিল।

ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর ও দক্ষিণার্ধের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা। দাসহীন রাষ্ট্রগুলি সংখ্যায় অধিক হইলে দাসপ্রথা রহিত করিবে, এই ছিল দক্ষিণার্ধের ভয়। এইজন্য কয়েকবার উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আপোষ হয়। কিন্তু নানাকারণে আপোষের সর্তগুলি ঠিকমত পালন করা হইত না। শেষে দেখা গেল যে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে আপোষ সংবিধানের বিরোধী। সুতরাং আপোষ দ্বারা দাসপ্রথার বিলোপ করা সম্ভব নহে ইহা স্পষ্ট বোঝা গেল। তখন উত্তরখণ্ডের লোকেরা অন্য উপায়ে দাসপ্রথা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহারা সাধারণতন্ত্রী দল নামে নূতন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

আব্রাহাম লিঙ্কন—আব্রাহাম লিঙ্কন অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় কিছুদূর পড়াশুনা করিয়া তিনি ওকালতি সুরু করিলেন এবং শীঘ্রই সৎ ও পরিশ্রমী বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অতি দীর্ঘকায় ছিলেন, মুখখানিতে ছিল গভীর চিন্তার ছাপ, চোখের দৃষ্টি শান্ত, করুণ। কিন্তু নীতির ব্যাপারে তিনি বজ্রের মত কঠোর হইতে পারিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দাসপ্রথা সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা কেবল দাসকেই হীন করে না—প্রভুকেও হীন করে। আমেরিকার অর্ধেক রাষ্ট্রে দাসত্ব থাকিবে, বাকী অর্ধেক রাষ্ট্রে থাকিবে না, এই বন্দোবস্ত চিরকাল থাকিতে পারে না; এ রকম বিচ্ছেদ দেশের ঐক্য ও প্রগতির বিরোধী। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি প্রথম হইতেই সাধারণতন্ত্রী দলের প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হইলে বিরোধ চরমে উঠে। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আলাদা হইয়া যায় এবং একটি স্বতন্ত্র সংযুক্ত রাষ্ট্র স্থাপন করে।

আব্রাহাম লিঙ্কন

গৃহযুদ্ধ—লিঙ্কন ঘোষণা করিলেন এই কার্য দেশের শাসনতন্ত্রের বিরোধী। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে থাকিয়া যাইবার জন্য তিনি আহ্বানও জানাইলেন। কিন্তু ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণী রাষ্ট্রসঙ্ঘ চার্লসটনের সামটার দুর্গ আক্রমণ করিল। ইহার ফলে

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গৃহযুদ্ধ প্রায় চার বৎসর চলে। লিঙ্কন প্রথমেই দাসপ্রথা রহিত করেন নাই। আমেরিকার ঐক্য রক্ষাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল এবং আপোষের জন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝিলেন এক মহৎ আদর্শের
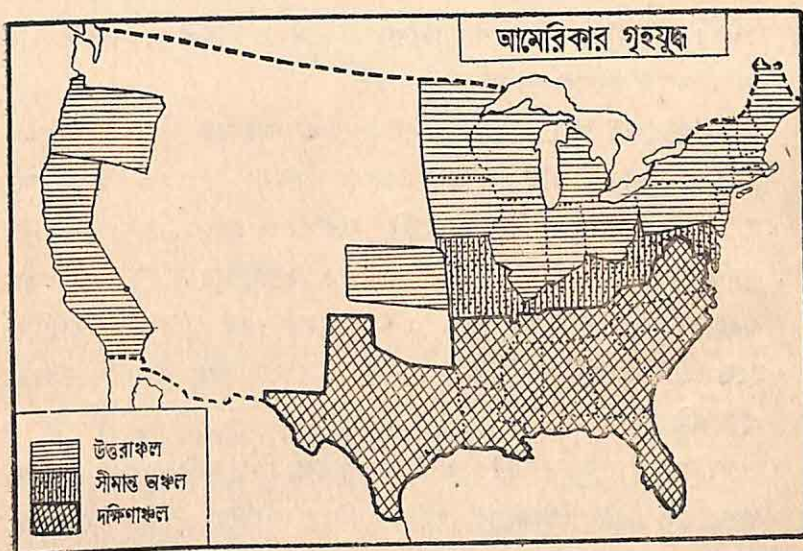
প্রেরণা ব্যতীত দেশ ভাগ বন্ধ করা যাইবে না। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দাসদের মুক্তি ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে উত্তরার্ধের নৌবাহিনী দক্ষিণী বন্দরগুলি অবরোধ করিয়াছিল এবং তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলি ওয়াশিংটন দখল করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে, কিন্তু গেটিসবার্গের যুদ্ধে জেনারেল লি উত্তরার্ধের বাহিনীকে টলাইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের অন্তিমক্রিয়া উপলক্ষ্যে লিঙ্কন এক বিখ্যাত ভাষণ দেন। তাহাতে তিনি বলেন, গণতন্ত্র জনসাধারণের মঙ্গলের

জন্য—জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের শাসন (Democracy is rule of the people by the people and for the people)। সেই হইল দক্ষিণের পরাজয়ের সূত্রপাত। সারম্যান ও গ্রান্টের বাহিনী দুই দিক হইতে দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করে এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাপোম্যাটক্সের যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষিণী সেনাপতি লি আত্মসমর্পণ করিলে গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

গৃহযুদ্ধের ফল—লিঙ্কন বলিয়াছিলেন কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যা না রাখিয়া, সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া, সত্যে ও ন্যায়ে দৃঢ় থাকিয়া এমনভাবে জাতির ক্ষতগুলি সারাইতে হইবে যেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসে। বাঁচিয়া থাকিলে পরাজিত দেশবাসীর সহিত সে রকম ব্যবহারই তিনি করিতেন, কিন্তু ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল আততায়ীর হস্তে এই মহাজীবনের অবসান হইল। ক্রীতদাসের কল্যাণে লিঙ্কন প্রাণবলি দিলেন।

নিগ্রো দাসগণ নাগরিক অধিকার পাইল, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল এই পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারিল না। নিগ্রোদের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ বাড়িল মাত্র। ক্লু ক্লাক্স ক্ল্যানের (Klu Klux Klan) মত নানা গুপ্তসমিতি স্থাপিত হইল। সুবিধা পাইলেই তাহারা নিগ্রোদের উপর উৎপীড়ন করিত। সামান্য অপরাধে নিগ্রোদের অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে এমন ঘটনা বিংশ শতাব্দীতেও বিরল নয়। ইহাকে 'লিঞ্চিং' (Lynching) বলে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতির বৈষম্য দূর করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ দিকের কোন কোন রাষ্ট্রে আজও বর্ণবিদ্বেষ বিদ্যমান। তবে আশা করা যায় শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও বিশ্বজনমতের চাপে ইহার মূল নষ্ট হইবে।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৮৫২ 'টম কাকার কুটীর' প্রকাশ
—১৮৬০ { লিঙ্কনের নির্বাচন
দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ
—১৮৬১ ফোর্ট সামটার আক্রান্ত—গৃহযুদ্ধ আরম্ভ
—১৮৬৩ ১লা জানুয়ারী দাসত্বের মুক্তি ঘোষণা
—১৮৬৫ অ্যাপোম্যাটক্স—গৃহযুদ্ধ শেষ
—১৮৬৫ ১৪ই এপ্রিল, লিঙ্কনের মৃত্যু

একাদশ পরিচ্ছেদ

এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার

উপনিবেশ বিস্তারের এলাকা—পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের সহিত বিশাল বিশ্বের পরিচয় হয়, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার সুরু করে। উত্তর আমেরিকায় যায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন; দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগাল; হল্যাণ্ড যায় প্রায় সকল দিকে। এশিয়া অঞ্চলে পর্তুগালের পর ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্য বিস্তার করে ভারতবর্ষে, হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ায়, ফ্রান্স ইন্দোচীনে ও রাশিয়া উত্তর এবং মধ্য এশিয়ায়। আফ্রিকায় রাশিয়া ব্যতীত প্রায় সব দেশই গিয়াছিল। অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হইবার পর আসে ইংল্যাণ্ডের আওতায়। প্রথমে সেখানে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত লোকদের পাঠানো হইত, পরে বহু লোক যায় প্রকৃতির সম্পদ হইতে অর্থ লাভের লোভে।

উপনিবেশ বিস্তারের কারণ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে উপনিবেশ বিস্তারের গতি আরও দ্রুততর হয় এবং প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপীয় প্রভুত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার তিনটি প্রধান কারণ ছিল। যানবাহনের অভূতপূর্ব উন্নতিকে প্রথম স্থান দিতে হয়। দীর্ঘ রেলপথের সাহায্যে রাশিয়া মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া মঙ্গোলিয়া, এমন কি উত্তর চীনের পোর্ট আর্থার বন্দর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। আবার বাষ্পীয় জাহাজের উন্নতির ফলে এবং সমুদ্রের ভিতর দিয়া তারবার্তা প্রেরণ সম্ভব হওয়ায় ইংল্যাণ্ড আফ্রিকায়, ভারতে ও চীনে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ কায়েম করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় কারণ শিল্প-বিপ্লব। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল। বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্পের প্রসার দিন দিন বাড়িতেছিল। এই ক্রমবর্ধমান শিল্পের উপাদান কাঁচামাল ইউরোপে জন্মিত না, অন্য দেশ হইতে আনিতে হইত। আবার উৎপাদিত পণ্য কিনিবার লোক কেবল ইউরোপে পাওয়া যাইত না, অন্য দেশে বাজার খুঁজিতে হইত। এশিয়া ও আফ্রিকা ছিল কৃষি-প্রধান দেশ। কাঁচামাল সেখানেই সস্তায় পাওয়া যাইত, আবার সেখানে স্থানীয় শিল্পের উন্নতি হয় নাই বলিয়া ইউরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্য লাভে বিক্রয় করা চলিত। তৃতীয়তঃ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে লোকসংখ্যা অত্যধিক ছিল বলিয়া মজুরীর হারও কম ছিল। ইউরোপের উদ্বৃত্ত মূলধন খাটাইবার এমন সুবিধা আর কোথাও ছিল না। তা ছাড়া ইউরোপের উদ্বৃত্ত লোক উপনিবেশে পাঠাইয়া দিয়া সহজে বেকার সমস্যার সমাধান হইত।

এই সব কারণে কেবল যে নূতন নূতন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল তাহা নহে, উপনিবেশের অধিকার লইয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল ও অনগ্রসর জাতিগুলিকে শোষণ করিবার জন্য তাহাদের লোলুপতার সীমা ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা নানারকম ভাল ভাল কথা দিয়া ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করে। তাহারা বলিতে থাকে, ভগবান শ্বেত জাতিকে পৃথিবীকে সভ্য করিবার মহৎ ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন ("white man's burden")।

আফ্রিকার রহস্য উন্মোচন—সে ভার যে কি বিষম, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও আফ্রিকা ছিল দুর্ভেদ্য অরণ্যে লুপ্ত—'কৃষ্ণ' অজানা মহাদেশ। উপকূল ভাগের কিছুটা ইউরোপীয় বণিকদের পরিচিত ছিল, আর ফরাসীরা অ্যালজিয়ার্সে ও ইংরাজরা উত্তমাশা অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তারপর আফ্রিকার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় পর্যটকদের অভিযান সুরু হইল। ডাক্তার লিভিংস্টোন অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিয়া এবং নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ও মধ্য আফ্রিকার নানা স্থান আবিষ্কার করেন (১৮৪০-৭৩)। নিরুদ্দেশ লিভিংস্টোনকে খুঁজিতে বাহির হইয়া সাংবাদিক স্ট্যানলিও কঙ্গো অঞ্চলে নানা স্থান আবিষ্কার করেন। আফ্রিকার সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদের কাহিনী ক্রমে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ভাগ লইয়া ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে তুমুল রেষারেষি বাধে। সে লোভের ইন্ধন যোগাইতে শেষে সমস্ত আফ্রিকাই খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়।

ইংরাজ ও আফ্রিকা—নেপোলিয়ানের সময় হইতে মিশরের উপর ফরাসী-প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু ইংরাজরা ইহা আদৌ পছন্দ করিত না। মিশর হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে—

এমন ভয় তাহাদের ছিল। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী যন্ত্রবিৎ ফার্দিনান্দ-দ্য-লেসেপ্‌স্ সুয়েজ খাল কাটিয়া লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের যোগ সাধন করিতে চাহিলে ইংরাজরা অনেক বাধা দেয়। তৎসত্ত্বেও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খনন শেষ হইল। ইউরোপ ও এশিয়ার দূরত্ব অনেকখানি কমিয়া গেল। আর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন রহিল না। ইংরাজরা দেখিল, তাহাদের এশিয়াস্থিত উপনিবেশগুলি, বিশেষতঃ ভারত সাম্রাজ্য, রক্ষা করিতে গেলে সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্ব অত্যাবশ্যক, সেখানে ঘাঁটি গাড়িতে পারিলে কোন ইউরোপীয় শক্তি ভারতে বৃটিশ আধিপত্য টলাইতে পারিবে না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী দূরদর্শী ডিজরেলী সুয়েজ খাল কোম্পানীর বহু অংশ কিনিয়া ফেলিলেন।

মিশরের খেদিভ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিকট অনেক টাকা দেনা করিয়াছিলেন। তাহা শুধিতে না পারায় মিশরের অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ইংরাজ ও ফরাসীদের হাতে গেল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিরোধ দমনের অছিলায় ইংরাজরা আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজ খাল ও কায়রো দখল করিল। মিশরী সৈন্য-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংরাজদের পছন্দমত সৈন্য নিয়োগ করা হইল এবং ইংরাজ অধ্যক্ষের ব্যবস্থা হইল। সুদানে প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়া ইংরাজরা ধর্মোন্মত্ত মাহদি ও তাহার দলের শত্রুতা অর্জন করে। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি গর্ডন খার্তুমে নিহত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কিচেনার মাহদি বিদ্রোহ দমন করিলে সুদানও ইংরাজদের প্রভাবাধীন হয়।

দক্ষিণে উনিশ শতকের গোড়া হইতে ইংরাজরা কেপ কলোনি দখল করিয়া বসিয়াছিল। শতাব্দীর শেষের দিকে সেসিল রোড্‌সের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা রোডেসিয়া করায়ত্ত করে, কিন্তু বুয়ার সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র

ট্রান্সভাল দখল করিতে গিয়া বিফল হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বুয়ার যুদ্ধ সুরু হয়। দক্ষিণের আদি ঔপনিবেশিক ডাচ কৃষকদের বুয়ার বলা হইত। ডাচরা প্রথম প্রথম জিতিলেও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কিচেনার তাহাদের পরাজিত করেন। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট অধিকৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও বিজিত বুয়ার উপনিবেশগুলি লইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা—ফরাসীরা উত্তর-আফ্রিকার অ্যালজিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে তাহারা পূর্বদিকে টিউনিস ও পশ্চিমে মরক্কোর দিকে অগ্রসর হয়। টিউনিসের শাসক বে (Bey) ফরাসী মহাজনদের কাছে টাকা ধারিতেন, তাছাড়া ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের উপর যাযাবর দস্যুর আক্রমণ তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। তদুপরি তিনি ইতালীকে টিউনিসের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে চাহিলেন। ফরাসীরা তখন টিউনিসের রাজধানী দখল করিল। ফরাসীরা সেখানে রেলপথ স্থাপন করিল ও জমিদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন খাটাইতে লাগিল। সেনেগাল হইতে উত্তর দিকে এবং অ্যালজিরিয়া হইতে দক্ষিণে বিস্তারলাভ করিতে করিতে ফরাসা অধিকার গিনি উপকূল এবং সাহারা অঞ্চলেও প্রসারিত হইল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীদের এক চুক্তি হয়, তাহাতে মরক্কো ফরাসী-প্রভাবের অধীন হয় আর মিশর পড়ে ইংরাজদের ভাগে।

জার্মানী ও ইতালী—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর আফ্রিকার উপর জার্মানীর দৃষ্টি পড়ে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আফ্রিকা ভাগের এক নীতি গৃহীত হয়। কঙ্গো স্বাধীন রাষ্ট্র পায় বেলজিয়াম; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়; জার্মানী নিজে টোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও

পূর্ব-আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চল রাখে। ইংল্যাণ্ড পায় কেনিয়া, উগাণ্ডা ও নাইজিরিয়া। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী জাঞ্জিবার ভাগ করিয়া লয়। টিউনিসিয়ায় বিফল হইয়া ইতালী আবিসিনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে চায়। আবিসিনিয়ার রাজার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করিয়া ইতালী আবিসিনিয়ার কর্তৃত্ব করায়ত্ত করে বটে, কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে আবিসিনিয়ার কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। অন্ততঃ তখনকার মত সোমালিল্যাণ্ডের ভাগ লইয়াই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়।

এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতি—ইতিমধ্যে এশিয়াতে রাশিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকায় সাইবেরিয়ায় রুশ উপনিবেশগুলির গুরুত্ব বাড়ে। সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য এবং চীন ও জাপানকে ভয় দেখাইবার সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়া রেলপথ নির্মাণ সুরু হয়। ইহার ফলে সুদূর প্রাচ্যের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। কোরিয়া অধিকারের উদ্দেশ্যে পোর্ট আর্থারে তৈরী হয় বিরাট নৌ-ঘাঁটি। দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত রুশ-প্রভাব বিস্তৃত হয়।

চীন বিভাগ—চীনের দুর্বলতার সুযোগ লইতে ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ কেহই ছাড়ে নাই। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের সঙ্গে এক যুদ্ধের ফলে চীনে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব সুরু হয়। সেই ক্ষমতা বাড়িয়া যায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর। আনামের রাজার আদেশে কয়েকজন খৃষ্টান প্রচারক নিহত হইলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান এক অভিযান পাঠান। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সায়গন সহ দক্ষিণ আনাম ফরাসীদের হাতে আসে, ইহার নাম দেওয়া হয় কোচিন-

চায়না। কাম্বোডিয়ার রাজা শ্যামের ভয়ে ফরাসীদের শরণ লইলেন। ইতিমধ্যে টংকিং-এ ফরাসী বণিকদের অসুবিধা হইতেছে—এই অজুহাতে এক সামরিক অভিযান প্রেরিত হইলে চীন সম্রাট টংকিংকে ফরাসী-সংরক্ষিত রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু চীন সৈন্য ইহা মানিয়া না লওয়ায় ফরাসীরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও এই যুদ্ধে জয়লাভের পর দক্ষিণ চীনে অবাধ বাণিজ্যাধিকার লাভ করে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইন্দোচীন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

ইহার পূর্বে দুইটি 'অহিফেন যুদ্ধে' ইংরাজদের কাছে চীনের শোচনীয় হার হইয়াছিল এবং বাধ্য হইয়া ইংরাজদের বহু বন্দরে অবাধ বাণিজ্যাধিকার দিতে হইয়াছিল। এই সব সংঘর্ষে চীনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। . ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া লইয়া চীন-জাপানের যুদ্ধ সুরু হয় এবং আবার চীন পরাজিত হয়। কিন্তু সিমানোসেকির সন্ধিতে জাপান যে সব অঞ্চল পায়, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তাহা কাড়িয়া লয়। রাশিয়া লয় পোর্ট আর্থার, ইংল্যাণ্ড উই-হাই-উই, জার্মানী কি-আও-চাও ও ফ্রান্স দক্ষিণ-চীনের এক অঞ্চল। তাহারা মাঞ্চুরিয়া এবং চীনের সর্বত্র রেলপথ বিস্তার করিবার অধিকারও পায়।

শীঘ্রই চীনে বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাষ্ট্রের গোপন সাহায্য ও সমর্থনে নানা সন্ত্রাসবাদী সমিতি গড়িয়া উঠে। ইহার পরিণতি হয় বক্সার বিদ্রোহে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ সুরু হয়। বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, পিকিং-এ বহু ইউরোপীয় নিহত হয় এবং ইউরোপীয় দূতাবাসগুলি বিধ্বস্ত হয়। ইহার প্রতিরোধকল্পে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একত্র হইয়া এক আন্তর্জাতিক বাহিনী পাঠায়। অতি নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়

এবং নিরুপায় চীন সরকার বিদেশীদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জও এই উপনিবেশের বেড়াজাল হইতে মুক্তি পায় নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা তাহিতি অধিকার করে। নিউগিনি জার্মানী, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ভাগ হয়; স্যামোয়া জার্মানী ও আমেরিকার মধ্যে। ইংরাজরা বহু দ্বীপ দখল করে। আমেরিকা স্পেনকে হারাইয়া ফিলপাইন ও হাওয়াই অধিকার করিলে প্রশান্ত মহাসাগরে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়।

সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল—এই পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্য শিকারের দুটি ফল ফলিয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যেই ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া বিরোধ বাধে। ইংরাজদের সৌভাগ্যে জার্মানী ও ইতালীর ঈর্ষ্যা হইল, আবার ইংরাজরা ভয় পায় রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারে। ইহার চেয়েও বড় ঘটনা—লাঞ্ছিত, শোষিত, উপদ্রুত এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মধ্যে এক অভিনব জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার। ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মন্তুদ অপচয়ে আর গণজাগরণের পরিণতির ফলে।

চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের অধিকাংশ সাম্রাজ্য-বাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তবু এশিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে জাতীয় আন্দোলনে আজও ভাঁটা পড়ে নাই।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৮৩০ অ্যাল্‌জিরিয়ায় ফরাসী কর্তৃত্ব আরম্ভ
—১৮৪০-৪২ প্রথম অহিফেন যুদ্ধ, ১৮৫৬-৬০ দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ
—১৮৬৯ সুয়েজ খাল সমাপ্ত
—১৮৮২ ইংল্যাণ্ড কর্তৃক কায়রো অধিকার
—১৮৮৪-৮৫ আফ্রিকায় জার্মান-কর্তৃত্ব আরম্ভ
—১৮৯১ সাইবেরিয়ায় রুশীয় রেলপথ স্থাপন
—১৮৯৩ ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন
—১৮৯৮ আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধ—ফিলিপাইন অধিকার
—১৯০০ বক্সার বিদ্রোহ
—১৯০৯ দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চীন ও জাপানের জাগরণ

চীন ও জাপান—বর্তমান যুগে চীন ও জাপানের ইতিহাসে যেমন অনেক মিল আছে, তেমনি পার্থক্যও আছে অনেক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত চীন ও জাপানে, বিশেষতঃ জাপানে, বহির্জগতের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রায় একই সময় উভয় দেশের উপর বৈদেশিক প্রভাব পড়ে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির চাপে উভয়েই নানারকম সুযোগ-সুবিধা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ড এবিষয়ে চীনে নেতৃত্ব নেয়, আমেরিকা—জাপানে। কিন্তু চীন ও জাপানে বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

চীনে ইংরাজ—ষোড়শ শতাব্দীতেই ক্যাথলিক প্রচারকেরা চীনে আসিতে সুরু করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল চীনের সঙ্গে ও হল্যাণ্ড জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু চীন ও জাপানের এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। চীনের লোকেরা বিদেশীদের বর্বর ভাবিত এবং চীন সম্রাট মনে করিতেন তাঁহার স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের বহির্জগৎ হইতে কিছু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। পর্তুগালের শক্তি নষ্ট হইলে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনের বন্ধ দ্বার মোচন করিবার প্রবল চেষ্টা করে। কিন্তু ক্যাণ্টন ব্যতীত অন্য কোন বন্দরে তাহাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। চীন হইতে ইংরাজরা কিনিত চা, রেশম ও নানকিন নামক কার্পাস বস্ত্র। এসব জিনিস কিনিবার জন্য প্রথমে তাহারা নগদ টাকা আনিত, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল চীনে আফিমের চাহিদা আছে, তখন হইতে বাংলা ও বিহারের আফিম আনিতে লাগিল। চীন সরকার আফিমের ব্যবহার ও ব্যবসায় বারংবার নিষিদ্ধ করিলেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও শুল্ক কর্মচারীদের ঘুষ দিয়া ইংরাজ বণিকগণ গোপনে আফিম আমদানী করিত।

অহিফেন যদ্ধ—এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ থাকিত বলিয়া তাহারা ক্রমশঃ ক্যাণ্টন ছাড়া অন্যান্য বন্দরেও আফিম লইয়া যায়। চীন দেশে আফিমের প্রচলন ভীষণ বাড়িয়া গেল। কয়েকজন বিদেশী বণিকের লোভের জন্য চীনের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইল, দৈহিক ও মানসিক সর্বনাশ হইতে চলিল। চীন সম্রাট এক কড়া আইন জারী করিয়া এই পাপ ব্যবসায় বন্ধ করিতে এবং জাহাজগুলি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিলেন। ইহার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'অহিফেন যুদ্ধ' বাধিল। ক্যাণ্টন ও সাংহাইয়ের পতন হইলে চীন সরকার ইংরাজদের

সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। নানকিং-এর সন্ধির ফলে চীন ইংরাজকে হংকং সমর্পণ করে এবং সাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যাধিকার ও প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেয়।

দ্বিতীয় 'অহিফেন যুদ্ধ' সুরু হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবার ফরাসীরাও ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিল। ক্যান্টনের নাগারকদের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও নগর রক্ষা হইল না। শত্রু প্রায় পিকিং-এর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে চীনকে এক অপমানজনক সন্ধি করিতে হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়াও চীনকে আরও কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত করিয়া দিতে হয় এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী বাণিজ্যের উপর শুল্ক কমাইয়া দিতে হয়। স্থির হয় যে চীনের আইন লঙ্ঘন করিলেও চীনপ্রবাসী বিদেশীদের বিচার চীনের আদালতে না হইয়া তাহাদের নিজেদের বাণিজ্য-প্রতিনিধির নিকট হইবে।

ইহার পর রাশিয়া চীনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমুর প্রদেশ দখল করিয়া লয়, ফরাসীরা—ইন্দোচীন। পরবর্তী কালে চীনের উপর চাপ দিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি দেশের অভ্যন্তরে রেলপথ নির্মাণ করিবার অনুমতি আদায় করে।

চীনের অধঃপতন—এই ভাবে মাঞ্চু সম্রাটের অক্ষমতার জন্য এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অবহেলা করার ফলে চীন তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারাইল। যন্ত্রজাত সস্তা বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহার অনবদ্য প্রাচীন শিল্প নষ্ট হইল; বিদেশী স্বার্থের নাগপাশে জড়াইয়া পড়িল তাহার বাণিজ্য ও রাজস্ব, বিদেশী ধর্মপ্রচারক জাতীয় সংস্কৃতিকে করিল অপমান। আপনার গৌরবময় ঐতিহ্যে বিশ্বাস হারাইয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল শক্তিতে অভিভূত হইয়া চীন হতাশায় গা ঢালিয়া দিল।

চীন-জাপান যুদ্ধ—জাপান ইউরোপীয় গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। পশ্চিমা শক্তিগুলির অনুসরণে সে-ও দুর্বল চীনের উপর চাপ দিতে সুরু করে। অনেক দিন হইতে তাহার লক্ষ্য কোরিয়ার উপর পড়িয়াছিল। কোরিয়ায় গৃহবিবাদ ঘটাইবার বহু চেষ্টার পর চীনের সঙ্গে জাপানের এক সন্ধি হয়, স্থির হয় যে কেহই কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। চীন চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে এই অজুহাতে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, জাপান কোরিয়া আক্রমণ করে এবং চীনা বাহিনীকে কোরিয়া হইতে তাড়াইয়া দেয়। সিমনোসেকির সন্ধিতে চীন জাপানকে ফর্মোসা ও লি-আও-টাং উপদ্বীপ ছাড়িয়া দেয় এবং কয়েকটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যাধিকার দেয়। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানীর সহিত একযোগে রাশিয়া এই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং জাপানকে নববিজিত স্থানগুলি ছাড়িতে বাধ্য করে। জাপান এ অপমান ভোলে না।

জাপানকে বঞ্চিত করিয়া রাশিয়া লইল পোর্ট আর্থার, জার্মানী সিংটাও এবং শানটুং, ইংরাজরা উই-হাই-উই। চীনের অভ্যন্তরে রেলপথ নির্মাণ করিবার ও তৎসন্নিহিত জমিজমা ভোগ করিবার অধিকারও ভাগ হইল। আমেরিকা এই সময় চীনের মিত্র রূপে অবতীর্ণ হয় এবং 'মুক্তদ্বার নীতি' (Open Door Policy) ঘোষণা করে, অর্থাৎ চীনের ভূমি লইয়া কাড়াকাড়ি চলিবে না, সকল বিদেশীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং শুল্ক দিতে হইবে পুরাপুরি। বলা বাহুল্য, কেহ এই ঘোষণা গ্রাহ্য করিল না।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—নিরন্তর আঘাতে ও অপমানে চীনের জাতীয় চেতনা অবশেষে জাগিয়া উঠে। শিক্ষিত শ্রেণী দাবী করিল শাসন-সংস্কার। বিদেশীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও চলিতে লাগিল। ইহার পরিণাম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহ। "বিদেশী শয়তানদের

নিধন কর"—এই রব তুলিয়া দলে দলে ক্ষিপ্ত চীনা খ্রীষ্টান ও ইউরোপীয়ানদের আক্রমণ করিল। আটটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনী পিকিং ধ্বংস করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের নির্মম প্রতিশোধ নেয়। চীনের উপর দুর্বহ অর্থদণ্ড চাপানো হয়। রাশিয়া চীনের উত্তরাংশে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া বসে।

সান ইয়াট সেন—দেশপ্রেমিকের দল ইহা নীরবে মানিয়া লইল না। তাহাদের নেতা হইলেন ডাক্তার সান ইয়াট সেন। বৈদেশিক শোষণ ও স্বদেশী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনিই বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণীকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে লইয়া গেলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি বিদ্রোহী। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে প্রগতি একমাত্র বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের পথেই সম্ভব। বিদেশে "নবজাগ্রত চীন" (সিং চুং হুই) নামে এক রাজনৈতিক সমিতি তিনি স্থাপন করেন এবং পরে তাহার প্রধান কেন্দ্র হংকং-এ স্থানান্তরিত করেন। দলে দলে চীনা যুবক এই দলে যোগ দেয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অপদার্থ মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্যবাহিনী জাতীয়তাবাদীদের বাধা না দেওয়ায় প্রথম প্রথম তাহাদের জয় হয়। কিন্তু ইউয়ান-সি-কাই নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে সম্রাট বিদ্রোহ দমনার্থ

সান ইয়াট সেন

নিয়োগ করিলে জাতীয়তাবাদীদের পরাজয় সুরু হয়। সান ইয়াট সেন বুঝিলেন ইউয়ানকে হাত করা দরকার। তাই বিপ্লবীদের অবিসংবাদিত নেতা হইলেও তিনি ইউয়ানকে প্রস্তাবিত চীন সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর মাঞ্চু সম্রাটের সিংহাসন তাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

চীনে গৃহবিবাদ—সাধারণতন্ত্রী চীনের তিনটি শত্রু ছিল—আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, পশ্চিমী শক্তিদের স্বার্থ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ। ইউয়ান-সি-কাই ইহার কোনটিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করিবার জন্য সান জাপানে গেলে ইউয়ানের মনে সম্রাট হইবার বাসনা জাগিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পরিষদ ও সানের দল কুওমিনটাং ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ানের মৃত্যু হইলেও ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে অরাজকতা চলে। ইউয়ানের সৈন্যাধ্যক্ষগণ চীনের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করিয়া বসে এবং স্বৈরাচার চালায়।

ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম মহাসমর আরম্ভ হইয়াছিল। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চীনের উপর নজর রাখিতে পারে নাই। জাপান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ভোলে না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান পোর্ট আর্থার দখল করিয়াছিল, এখন চীনের জার্মান-অধিকৃত অংশ কাড়িয়া লইল। ভার্সাই-এর সন্ধিতে চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জাপানের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। এ সংবাদ চীনে পৌঁছিবামাত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে। সান ইয়াট সেন ক্যান্টনে এক বিপ্লবী সরকার স্থাপন করেন (১৯২১)।

সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় চীনা সাম্যবাদী দলের সঙ্গে সন্ধি করিয়া কুওমিন্টাং পিকিং সরকারকে পরাজিত করে। ইহার অল্পদিন মধ্যেই ক্যান্সার রোগে সানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'সান মিন চুই' অর্থাৎ জনগণের তিন নীতি নির্ধারণ করিয়া যান। তাহাতে জাতীয় ঐক্য, গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি এবং জীবিকা অর্জনে জনসাধারণের জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হয়। সানের শিষ্য এবং সাধারণতন্ত্র সেনাবাহিনীর অন্যতম স্রষ্টা চিয়াং কাই-শেক তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

চিয়াং কাই-শেক

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিন্টাং ও সাম্যবাদী দলের মধ্যে মত ও পথ লইয়া বিরোধ বাধিল। আবার চীনে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাম্যবাদী শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক আন্দোলন যতই প্রবল হইতে থাকিল, জমিদার, শিল্পপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভয় ততই বাড়িতে লাগিল। চিয়াং কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলে সাম্যবাদীরা কিয়াংসি প্রদেশে আশ্রয় লইয়া স্বতন্ত্র সামাবাদী সৈন্যদলগঠনে মন দেয়। কিন্তু চিয়াং-এর উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহারা কিয়াংসি ছাড়িতে বাধ্য হয়। অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া প্রায় ছয় হাজার মাইল হাঁটিয়া পার হইয়া তাহারা চীনের উত্তর-পশ্চিমে কান্সু প্রদেশে আশ্রয় লয় এবং তথায় সাম্যবাদী সরকার

প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে চীনের প্রায় সমস্ত প্রদেশে চিয়াং-এর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ—চীনের গৃহযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ লইয়া জাপান ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া দখল করে। চীন জাতিসঙ্ঘের নিকট সাহায্যের আবেদন করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান প্রবল বিক্রমে চীনের প্রধান ভূখণ্ড আক্রমণ করে। জাপানকে প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া চিয়াং সাম্যবাদ দলনেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু পরে একদল সৈন্য ইহাতে আপত্তি করিল। তাহাদের চাপে চিয়াং সাম্যবাদীদের সহিত মিলিত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিশিয়া গেল। নবলব্ধ ঐক্যের উৎসাহে এবং দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় চীনের জনগণ জাপানকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

মধ্যযুগে জাপান—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত জাপান দুর্বল রাষ্ট্র ছিল। পর্তুগাল ও হল্যাণ্ড ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকগণের তিক্ত বাদানুবাদে বিরক্ত হইয়া এবং বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া জাপান বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া জাপান আপন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তখন সেখানে সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত যোদ্ধা অধিকাংশ সম্পত্তির মালিক ছিল, তাহাদের বলা হইত 'সামুরাই'। তাহারা 'বুশিডো' নামে এক কঠোর নীতি মানিয়া চলিত। আত্মসম্মানরক্ষার্থ তাহারা অন্যকে হত্যা করিতে পারিত এবং অপমান সহ্য করা অপেক্ষা আত্মহত্যাও শ্রেয়ঃ মনে করিত। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান নাইটদের মত তাহারা অবিরত

নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিত। মিকাডো নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল 'সামুরাই' নামে পরিচিত শক্তিশালী সামরিক শ্রেণীর হাতে।

নূতন জাপানের অভ্যুদয়—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথু পেরি নামক আমেরিকান নৌ-সেনাপতি চারটি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া জাপানের তীরে ভিড়িলেন এবং বাণিজ্যের অধিকার চাহিলেন। দুর্বল জাপান প্রবল পাশ্চাত্ত্য শক্তির কাছে মাথা নত করিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিল। তাহাদের গোলার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িল জাপানের প্রাচীন সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইল। জাপানীরা বুঝিতে পারিল অবিলম্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দীক্ষিত ও পাশ্চাত্ত্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে না পারিলে জাপানকে চীনের মতই পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিতে হইবে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার প্রবর্তিত হইল তাহা মধ্যযুগের জাপানকে কয়েক বৎসরের মধ্যে শক্তিতে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সমকক্ষ করিয়া তুলিল। সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হইল। প্রজারা হইল জমির মালিক। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করা হইল। সৈন্যবাহিনী আধুনিক ইউরোপীয় প্রথায় গঠিত হইল। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা সম্রাটের

জাপান সম্রাট য়োশি হিতো

হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। নবগঠিত প্রতিনিধি সভা বা পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি এক ক্ষুদ্র মন্ত্রণা-পরিষদের কথা শুনিতেন। মন্ত্রীদের চেয়ে স্থল ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের শক্তি ছিল বেশী। সূর্য দেবতার বংশধর রূপে সম্রাট পূজা পাইতে লাগিলেন। ভালমন্দ বিচার না করিয়া সম্রাটের আদেশ পালনই হইল জাপানী দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা।

রুশ-জাপান যুদ্ধ—মেইজির সংস্কারের ফলে জাপানের শিল্প অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য উপনিবেশ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজার দরকার হয়। প্রথম হইতেই দুর্বল চীন জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোরিয়ায় রুশ-প্রভাব বৃদ্ধি জাপানের মনে ভয় জাগাইয়াছিল, মাঞ্চুরিয়ার সম্পদের প্রতি লোভও মাথা তুলিতেছিল। কোরিয়া লইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রুশিয়া জাপানকে বঞ্চিত করিয়া লি-আও-টাং উপদ্বীপ গ্রাস করিয়া রেলপথ বসাইল এবং পোর্ট আর্থার ও ডেইরেনে নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ করিল। জাপানের কাছে ইহা অসহ্য মনে হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিল। সুশিমা প্রণালীতে জাপানের নৌ-বাহিনী একুশটি রুশ যুদ্ধজাহাজ ডুবাইয়া দিল। তদুপরি পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় হইল। ফলে তাহাকে লি-আও-টাং প্রত্যর্পণ করিতে হইল। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথও আসিল জাপানের হাতে। রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান এশিয়ার প্রধানতম রাষ্ট্রে পরিণত হইল, আর তাহাকে তুচ্ছ করিতে কেহ সাহস করিল না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া গ্রাস করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনের বিরাট মূল ভূখণ্ড দখলের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাপান—প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করিয়া জাপান চীনের জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করে। ভার্সাই সন্ধিতে সে কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। আমেরিকা জাপানের এই দ্রুত অগ্রগতিতে শঙ্কিত হয় এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে নৌ-সম্মেলন আহ্বান করে। তাহাতে স্থির হয় যে জাপানকে সানটুং ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহার নৌ-শক্তি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার নৌ-শক্তির তিন-পঞ্চমাংশের বেশী হইতে পারিবে না।

চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে কুয়োমিন্‌টাং যখন চীনে জাতীয় ঐক্য আনিল তখন জাপান বুঝিল চীনকে আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। চীন প্রবল হইলে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার বন্ধ হইবে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল এবং জাতিসঙ্ঘের কোন প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া সেখানে তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করিল। ইতিমধ্যে চীনের লোক জাপানী দ্রব্য বর্জন করিয়াছিল। তাহাদের ভয় দেখাইয়া সে নীতি ত্যাগ করাইবার জন্য জাপান ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই-এর উপর বোমা বর্ষণ করিল। ইতিমধ্যে মঙ্গোলিয়াও তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। দেশের সমূহ বিপদ বুঝিয়া চিয়াং কাই-শেক সাম্যবাদীদের সহিত বাধ্য হইয়া মিলিত হইলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই চীনের প্রধান ভূখণ্ড জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হইলে চীনের সমস্ত দল একযোগে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি ও উত্তরের কয়েকটি প্রদেশ দখল করিলেও জাপান চীনের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিতে পারে নাই। তাহার বর্বর অত্যাচারে চীনের প্রতিরোধ শক্তি বরং বাড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সহিত মিশিয়া যায়।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৮৪০ প্রথম 'অহিফেন' যুদ্ধ
—১৮৫৩ সেনাপতি পেরির আগমন
—১৮৫৬ দ্বিতীয় 'অহিফেন যুদ্ধ'
—১৮৬৭ জাপানে মেইজি যুগের আরম্ভ
—১৮৯৪ চীন-জাপান যুদ্ধ
—১৯০০ বক্সার বিদ্রোহ
—১৯০৪-০৫ রুশ-জাপান যুদ্ধ
—১৯১১ চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
—১৯২১ { ক্যাণ্টনে বিপ্লবী সরকার স্থাপন; ওয়াশিংটনে নৌ-সম্মেলন }
—১৯২৭ কুয়োমিন্‌টাং ও সাম্যবাদীদের বিরোধ
—১৯৩১ জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ
—১৯৩৭ জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র

রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশে যে বিপ্লব হইয়াছিল, ফরাসী বিপ্লবের মতই তাহা মানব-ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়াছিল ; কিন্তু শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। রুশ বিপ্লবের ফলে তাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাইয়া সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার্ল্ মার্ক্স্—ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লব হইয়াছিল। কৃষিজমির পরিমাণের অনুপাতে লোক-সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতে থাকে যে দলে দলে ভূমিহীন কৃষক কলকারখানায় কাজ করিবার জন্য সহরাঞ্চলে আসে। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা যে সকল মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, জার্মান দার্শনিক কার্ল্ মার্ক্স্ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানব-সমাজ কি ভাবে গঠিত হয়, কি ভাবে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে এবং সেই শ্রেণী-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া নূতন সমাজের জন্ম হয়, সে সম্বন্ধে তিনি পড়াশুনা ও চিন্তা করিতে থাকেন।
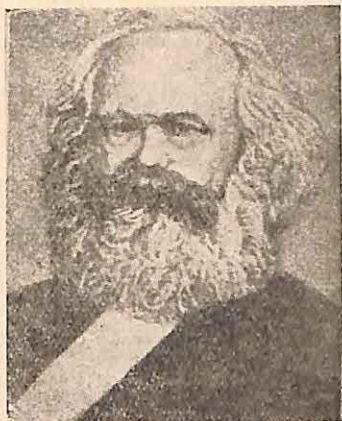
কার্ল্ মার্ক্স্

শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুষ্টিমেয় ধনী বর্তমান সমাজের অধিকাংশ সম্পত্তির মালিক। শ্রমিক এবং কৃষকদের শোষণ করিয়া তাহারা আরও বড়লোক হইতেছে। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কর্ণধার, নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আইন-কানুন তৈরী করিতেছে এবং স্বার্থবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন দমন করিতেছে। কিন্তু মার্ক্সের মতে ইহাদের পতন অনিবার্য। প্রত্যেক দেশে এরকম ধনিক শ্রেণী রহিয়াছে এবং তাহাদেরই চাপে রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। এই প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের শেষে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের চাপে ধনিক শ্রেণীর লোপ

সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই শ্রমিকদের দলবদ্ধ হইয়া নির্মম শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিতে হইবে। শ্রেণী-সংগ্রামে ধনিকদের পরাজিত করিয়া শ্রমিকরা রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবে। তখন ধন আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রযুক্ত হইবে। এই ব্যবস্থার নাম সমাজবাদ, ইহার পূর্ণ পরিণতি হইবে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া—ইংল্যাণ্ড শিল্প-বিপ্লবে সকলের অগ্রণী ছিল এবং সেখানকার শ্রমিকরাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ হয়। কিন্তু সমাজবাদী বিপ্লব প্রথম আসিল রাশিয়ায়। রাশিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি হইতে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। সেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ অবসান হয় নাই। 'জার' উপাধিধারী সম্রাট ছিলেন জমিদারদের নেতা ও দেশের শাসক। গুপ্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি স্বৈরাচার চালাইতেন। দেশের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র এবং অশিক্ষিত কৃষক। রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অন্যত্র শিল্পের প্রসার হয় নাই। এই সব শিল্পের মূলধন আবার বিদেশ হইতে আসিত। শ্রমিকদের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। জঘন্য নোংরা বস্তিতে তাহারা পশুবৎ জীবন যাপন করিত। যে মজুরী পাইত তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না। কথায় কথায় চাকুরি যাইত এবং তাহাদের উপর সব সময় গুপ্ত পুলিশের প্রখর দৃষ্টি ছিল। শাসনতান্ত্রিক এবং সন্ত্রাসবাদী—উভয় উপায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালাইতেছিল। কিন্তু একে তাহাদের সংখ্যা অল্প, তদুপরি তাহাদের মধ্যে বহু দল। একতা এবং সুনিশ্চিত কর্মপদ্ধতির অভাবে তাহারা অতি সহজেই পুলিশের ফাঁদে পা

দিত। তারপর সন্ত্রাসবাদীদের হইত প্রাণদণ্ড বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, অন্যদের দীর্ঘ কারাবাস।

লেনিন—মার্ক্‌সের মতবাদ এবং বিপ্লবের পন্থা যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, রুশদেশে তাহাদের নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির উলিয়ানভ। নিকোলাই লেনিন নামেই তিনি বেশী পরিচিত। তাঁহার দাদা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। লেনিন এ দুঃখ কোনোদিন ভোলেন নাই। তবে সন্ত্রাসবাদী নারদ্‌নিক্‌দের (Narodnik) দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার আদর্শ ছিল—জনগণের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া বিপ্লব সাধন। এই নূতন আদর্শের প্রচারকার্য চালাইতে গিয়া তাঁহাকে অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, এমন কি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে যাইতে হয়। কিন্তু তাঁহার বিপ্লবী

লেনিন

আদর্শ শত আঘাতেও অটুট থাকে। তিনি শেষে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 'ইস্‌ক্রা' (বা "স্ফুলিঙ্গ") নামক পত্রিকার মারফৎ বিপ্লব প্রচার করিতে থাকেন। রাশিয়ার গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের সহিত প্লেখানভ প্রভৃতি পূর্ববর্তী সমাজবাদীদের মতদ্বৈধ হয়। সংখ্যাধিক্যের

জন্য লেনিনের দলকে বলা হইত বলশোভক, বিরুদ্ধ দলকে মেনশেভিক।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়ার অভাবনীয় পরাজয় ঘটিলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। জারের শীত কাটাইবার প্রাসাদের (Winter Palace) সম্মুখে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলিলে সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদল ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং 'প্রথম সোভিয়েত' বা শ্রমিক সমিতি স্থাপন করে। বাধ্য হইয়া জার কিছু কিছু সংস্কার করেন। কিন্তু শীঘ্রই সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা হইল, সংস্কারও প্রত্যাহৃত হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও জারের পতন—কিন্তু রুশ সরকার ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। রাসপুটিন নামে জনৈক ভণ্ড সন্ন্যাসী জার ও জারমহিষীকে বশীভূত করিয়া ফেলে ও তাহার অসৎপ্রভাবে অত্যাচার ও অরাজকতা দিন দিন বাড়ে। এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। রুশ সরকারের অক্ষমতায় ও কালো-বাজারীদের লোভের ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। সৈন্যগণ খাদ্য পাইল না, গোলাগুলি পাইল না, জার্মানদের কাছে বার বার হারিতে লাগিল। দেশেও দেখা দিল নিদারুণ খাদ্যাভাব। সাম্যবাদী প্রচারকগণ এই সুযোগে সৈন্য ও জনগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ জারকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল। প্রথমে প্রিন্স্ লভভ্ ও পরে কেরেন্স্কি এক সাধারণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করিলেন। রুশ জনগণ ও সৈন্যবাহিনী শান্তির আশা করিয়াছিল ; কিন্তু মিত্রপক্ষের চাপে ও বিপ্লবের ভয়ে তাঁহারা যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে সরকার জনপ্রিয়তা হারাইল। সৈন্যেরা সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

ইতিপূর্বে সেণ্ট পিটার্সবার্গে, মস্কো ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিক ও সৈনিক দল আবার 'সোভিয়েত' গঠন করিয়াছিল। তাহারা পুরাপুরি বিপ্লবী ছিল না। জারের পদত্যাগের পর ক্ষমতা হাতে পাইয়াও তাহারা উহা প্রিন্স ল্ভভ্ ও কেরেন্স্কি প্রভৃতি মধ্যবিত্ত উদারতন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। লেনিন মনে করিলেন ইহাতে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা হইবে না। তিনি রাশিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং বলশেভিকদের সত্যকার বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বলশেভিকরা দাবী করিল—সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা, কৃষককে জমি, নিরন্নকে অন্ন এবং জনগণকে শান্তি দিতে হইবে।

বলশেভিক বিপ্লব—এই সময় জার পক্ষীয় সেনাপতি কর্নিলভ্ সেণ্ট পিটার্সবার্গের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে বলশেভিকরা তাঁহার আক্রমণ রোধ করিয়া সোভিয়েতগুলির উপর কর্তৃত্ব পায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব আরম্ভ হইল। এক দিনের মধ্যেই রাজধানী বলশেভিকদের করায়ত্ত হয়। কেরেন্স্কি সরকার কর্পূরের মত উবিয়া গেল। লেনিন ঘোষণা করিলেন—জমি কৃষকদের! সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সর্বত্র বলশেভিক সরকারের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং বলশেভিক বা কমিউনিস্টদের কর্তৃত্বে বিপ্লবী সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে লেনিন জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করেন। ইহাতে সৈনিকদলের সহানুভূতিও বলশেভিকরা পায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই সোভিয়েত রাশিয়াকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, গৃহশত্রু ও বৈদেশিক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা ভাবিল রুশ বিপ্লবের

ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্যবাদী বিপ্লব দেখা দিবে। সেজন্য তাহারা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে অঙ্কুরে বিনাশ করার চেষ্টা করে। এই সুযোগ নিল রাশিয়ার অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রী, মেনশেভিক প্রভৃতি দল। যুদ্ধ ও অরাজকতার ফলে দেশে দেখা দিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। কিন্তু বিপ্লব রাশিয়ার জনগণের চিত্তে এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল যে অদ্ভুত ধৈর্যের সহিত, অসামান্য কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহারা গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকে। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালে লেনিনের প্রধান সহায়ক ছিলেন ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিন। ট্রট্স্কি বিখ্যাত লাল ফৌজ বা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেন। স্ট্যালিন রাশিয়ার অধীনস্থ জাতিদের মুক্তি ঘোষণা করিয়া তাহাদের দলে টানেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ক্রমে ক্রমে নূতন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

ট্রট্স্কি

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন—কিন্তু শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠন যুদ্ধজয়ের অপেক্ষা কঠিন। লেনিন ও তাঁহার সহকর্মিগণ অদম্য উৎসাহে এই কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সমস্ত কলকারখানার রাষ্ট্রীয়করণ সম্পন্ন হইল। শিল্প হইল জনসাধারণের সম্পত্তি। সরকার তাহাদের কল্যাণের জন্য সেগুলি পরিচালনা করিতে লাগিল। বিপ্লবের

প্রথমেই কৃষকেরা জমিদারের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়াছিল। দেখা গেল এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে চাষ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। উৎপাদন না বাড়িলে শিল্পবিস্তার বন্ধ হইবে, দুর্ভিক্ষও রোধ করা যাইবে না। সুতরাং যাহাতে গ্রামের সব চাষী আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যৌথভাবে জমি চাষ করে তাহার ব্যবস্থা হইল। জোতদারদের (kulak) উচ্ছেদ করিয়া সৃষ্টি হইল যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান (collective farm)। অবশ্য শিল্পের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইল। দিকে দিকে গড়িয়া উঠিল বিরাট কলকারখানা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নদীতে নদীতে বাঁধ দেওয়া হইল। রাস্তা-ঘাটের হইল বিস্ময়কর উন্নতি। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রচিত হইল শ্রমিকাবাস, ব্যায়ামাগার, আরোগ্য-নিকেতন, শিশুসদন ও প্রসূতিসদন। প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দেওয়া হইল এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা হইল। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইহার ফলে দেশের ধনসম্পদ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। জারের আমলে যে রাশিয়া ইউরোপের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর জাতি ছিল, শিল্পে

স্ট্যালিন

কৃষিতে শিক্ষায় তাহাই আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল দেশ হইয়া উঠিয়াছে।
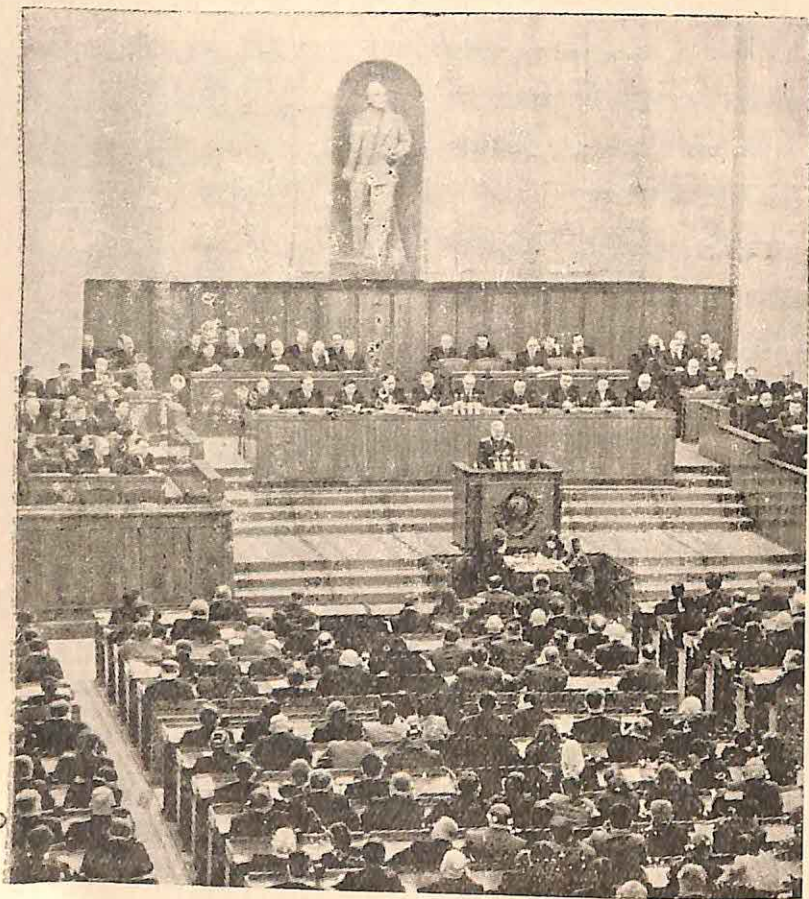
সুপ্রীম সোভিয়েতের বৈঠক

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কির সহিত মত ও কর্তৃত্ব লইয়া স্ট্যালিনের বিরোধ বাধিলে ট্রট্স্কি নির্বাচিত হন। স্ট্যালিন হন

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
০ ৪০০ ৮০০
মাইল
উত্তর মহাসাগর
বেরিং সাগর
ওখটস্ক সাগর
মাঞ্চুরিয়া
সিনকিয়াং
পারস্য
আফগানিস্তান
ভারত
তুরস্ক
রুমানিয়া
পোল্যাণ্ড
বলটিক সাগর
ফিনল্যাণ্ড
মস্কো
(১) রুশীয় সোস্যালিস্ট ফেডারেটেড রিপাব্লিক
(২) কারেলো ফিনিশ
(৩) এস্থোনিয়া
(৪) ল্যাটভিয়া
(৫) লিথুয়ানিয়া
(৬) বেলোরাশিয়া
(৭) মোলডাভিয়া
(৮) ইউক্রেন
(৯) জর্জিয়া
(১০) আজেরবাইজান
(১১) আর্মেনিয়া
(১২) কাজাকিস্তান
(১৩) তুর্কমেনিস্তান
(১৪) উজবেকিস্তান
(১৫) তাজিকিস্তান
(১৬) কিরঘিজিয়া

দেশের নায়ক। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিন নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন, তাহাতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও গোপন ভোটদানের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিন ছিলেন দেশের অবিসংবাদিত নেতা এবং প্রধানতঃ তাঁহারই সামরিক চালে ও সুষ্ঠু ব্যবস্থার গুণে প্রাথমিক পরাজয় সত্ত্বেও লালফৌজ শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র—নবীন রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হইল সোভিয়েত। জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া স্থানীয় সোভিয়েত গঠিত হয়। স্থানীয় সোভিয়েত প্রতিনিধি পাঠায় জেলার সোভিয়েতে। এইভাবে পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা প্রদেশ ও কেন্দ্রায় সোভিয়েতও গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সোভিয়েত 'প্রেসিডিয়াম' বা সরকার নির্বাচন করে। দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলকে স্বীকার করা হয়—সেটি সাম্যবাদী দল। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে দলের বাহিরে অদলীয় বহু প্রতিনিধিও নির্বাচিত হয়। মধ্য-এশিয়ায় উজবেক, তাজিক প্রভৃতি জাতির দেশ এখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ
—১৮৪৮ মার্ক্সের সাম্যবাদের ইস্তাহার
—১৮৭০-৮০ রুশদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন
—১৮৯৬ লেনিনের নির্বাসন
—১৯০৩ বলশেভিক ও মেনশেভিক দলের সৃষ্টি
—১৯০৫ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব
—১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ
—১৯১৭ ১৫ই মার্চ —জারের সিংহাসন ত্যাগ
৭ই নভেম্বর—বলশেভিক বিপ্লব
—১৯১৮-২১ গৃহযুদ্ধ
—১৯২৪ লেনিনের মৃত্যু
—১৯২৭ প্রথম পঞ্চবার্ষিকা পরিকল্পনা আরম্ভ, ট্রট্স্কির নির্বাসন
—১৯৩৬ স্ট্যালিন কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ—বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছে। তাহার ফলে কেবল যে মানুষের অসীম দুর্গতি ও সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, ইতিহাসের ধারাও বদলাইয়া গিয়াছে। উভয় যুদ্ধই জার্মানী সুরু করিয়াছিল, কিন্তু কেবল জার্মানীকেই সেজন্য দায়ী করা চলে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং উপনিবেশ ও বাণিজ্য লইয়া বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা—এই দুইটিই শান্তি-ভঙ্গের মূল কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধিত হয় এবং ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া সামরিক দিক হইতে জার্মান সাম্রাজ্য ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে জার্মানীর শিল্প অতি দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতে থাকে। বহুদিনের সামরিক ঐতিহ্য, বিরাট সৈন্যবাহিনী ও উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ দিল এই নবলব্ধ যান্ত্রিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। জার্মান সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়াম বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিলেন। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া (১৮৭৯) জার্মানীর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়া গেল। ইতালীও জার্মানীর সহিত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইল।

কিন্তু নানা কারণে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানীর বিরোধ বাধিল। ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য, নৌবল ও শিল্প কাইজার উইলিয়ামের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে। নৌবল ও বাণিজ্যবিস্তারে ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ হইবার উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থব্যয়ে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জার্মানী নৌবহর বাড়াইতে থাকে। ফ্রান্স পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি ভোলে নাই। জার্মানীর তোড়-জোড় দেখিয়া সে নূতন আক্রমণের আশঙ্কা করিতে থাকে। জার্মানী পূর্বদিকে প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিলে রাশিয়াও শঙ্কিত হয়। এই পরিস্থিতিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিলন স্বাভাবিক ছিল। এই তিনটি দেশ বর্তমানে শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়। তখন ইউরোপ দুইটি যুদ্ধশিবিরে বিভক্ত হইল—একদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালী, আর একদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড। উভয় পক্ষের মধ্যে সমরসজ্জার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—সার্ব্ জাতির স্বাধীন রাজ্য সার্বিয়া ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর প্রতিবেশী, কিন্তু কয়েক লক্ষ সার্ব্ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে বাস করিত। তাহারা স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলন চালাইতেছিল। বিপ্লবী দলের জনৈক সভ্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজকে হত্যা করিলে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়াকেই দায়ী করিয়া আক্রমণ

চালায়। জার্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পক্ষে যোগ দিলে মিত্রশক্তি (অর্থাৎ ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড) জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ চার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এবং পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বড় রাষ্ট্র ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। তুরস্ক জার্মানীর দলে এবং ইতালী ও জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'লুসিটানিয়া' জাহাজ জার্মান টর্পেডোর আঘাতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলে বহু আমেরিকান যাত্রীর প্রাণ যায়। তখন আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বলশেভিক বিপ্লবের পরে রাশিয়া জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করে। পৃথিবীর বহু জাতি এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল এবং পৃথিবীর নানাস্থানে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। তাই এই যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ট্যাঙ্ক

মারণাস্ত্রের ব্যবহার—বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কত রকমের মারণাস্ত্র যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, হাউইট্‌জারের মত ভারী কামান, বোমারু বিমান ইত্যাদি এই সময় ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগ এই যুদ্ধে আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষ মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া নূতন কায়দায় যুদ্ধ চালাইতে থাকে। তাহার ফলে অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে। ইউরোপের কত সমৃদ্ধ সহর ধ্বংস হইয়া যায়, কত

শস্যশ্যামল ক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হয়, কত প্রতিভাবান কবি ও শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা আশী লক্ষের কাছাকাছি গিয়াছিল। প্রাণের ও সম্পদের এমন নিদারুণ অপচয় ইতিপূর্বে ঘটে নাই।

জার্মানীর পরাজয়ঃ ভার্সাই সন্ধি—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে অবসন্ন ও মিত্র-পরিত্যক্ত জার্মানী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভাঙিবার শেষ চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি সন্ধির সর্ত আলোচনা করিবার জন্য ভার্সাইতে সমবেত হইল। ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেসোঁ, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন। বিজয়ী মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি রূপে ইঁহারাই সন্ধির সর্ত নির্ধারণ করেন।

ভার্সাই-আলোচনায় স্থির হইল স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনে প্রত্যেক জাতির অধিকার রহিয়াছে। সেই ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি পুনর্গঠিত হইল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যে নানা জাতির বাস ছিল। তাহাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দিবার জন্য ঐ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া চেকোস্লোভাকিয়া এবং পরিবর্ধিত রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া তৈরী করা হইল। রাশিয়ার অধীন ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এবং রাশিয়া, জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা পাইল। জার্মানীর নিকট হইতে ফ্রান্স পাইল আল্‌সেস্-লোরেন ও সার, পোল্যাণ্ড পাইল পশ্চিম প্রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া পাইল সাইলেসিয়ার কিয়দংশ। জার্মানীর

উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল, স্থল ও নৌ-বাহিনীর আয়তন অনেক কমাইয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে যুদ্ধাপরাধ স্বীকার করিতে হইল। তাহার উপর বিপুল ক্ষতিপূরণের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল। অপমানিত জার্মানী প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এই মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিছুটা দায়ী।

জাতিসঙ্ঘ—ভার্সাই বৈঠকের আলোচনার ফলে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) সৃষ্টি হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও আপোষের ভিতর দিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষা। ইহার প্রাথমিক সভ্য ছিল বিজয়ী মিত্রপক্ষ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ; পরে বিজিত দেশগুলিও ইহাতে প্রবেশের অধিকার পায়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন পরিকল্পনাটির জন্ম দিলেও আমেরিকা শেষ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয় নাই। জাপান, ইতালী ও জার্মানী পরবর্তী কালে সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল। রাশিয়া ১৯৩৬ সালে জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয়। জাতিসঙ্ঘের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল জেনেভায় এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় হেগে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য এই আদালত স্থাপিত হয়।

বিশ্বশান্তি স্থাপনের কার্যে জাতিসঙ্ঘ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কিছু কিছু বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইলেও কার্যকরী ক্ষমতার অভাবে জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হয়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি আপন আপন স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রতিটি সঙ্কটে জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা ধরা পড়ে। জাপান মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসঙ্ঘ কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের বিলোপ ঘটে।

জাতিসঙ্ঘের এক বৈঠক
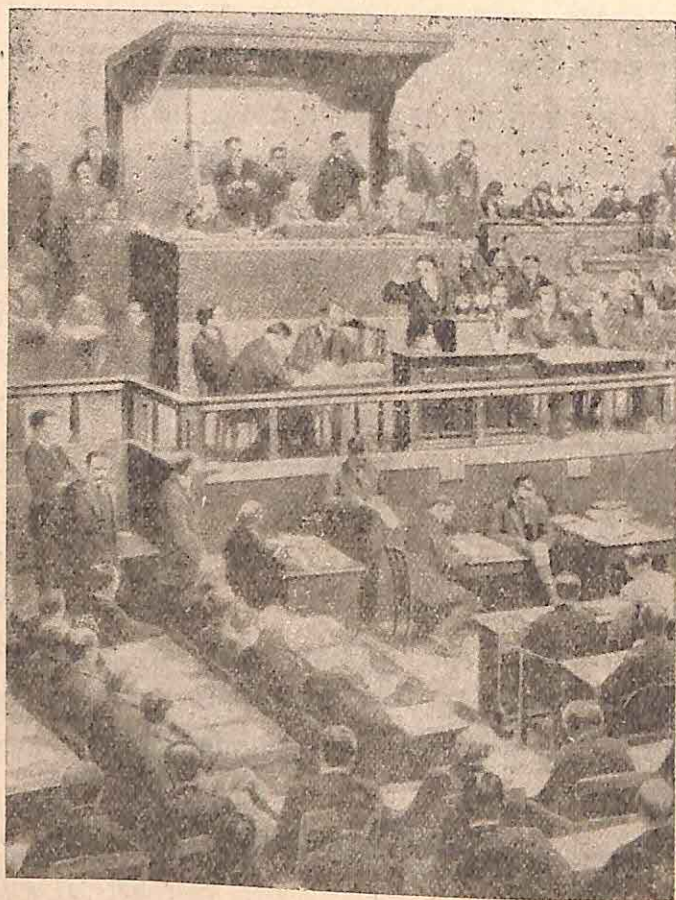
ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনি—যুদ্ধজনিত বিপুল ক্ষতি ও ভার্সাই চুক্তির ত্রুটি নানা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিবার প্রতিদানে ইতালী আড্রিয়াতিক সাগরের তীরবর্তী কয়েকটি স্থান দাবী করিয়াছিল। ভার্সাইতে সে দাবী স্বীকৃত না হওয়ায়

ইতালীতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তদুপরি দেখা দেয় অর্থনৈতিক সঙ্কট। ইতালীর মত দরিদ্র দেশে যে নেতা সুদিন আনিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তাহাকেই বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইহার সুযোগ লইয়া মুসোলিনির নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদী ফাসিস্ত্ দলের অভ্যুত্থান হয়। এই দলের সাহায্যে তিনি দেশের শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিজের হস্তগত করেন। বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া, পথঘাট সংস্কার করিয়া ও জলাজাঙাল পরিষ্কার করিয়া মুসোলিনি দেশের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ বিপুল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে গিয়া রাষ্ট্রের সকল সম্পদ ব্যয় হইতে লাগিল। গণতান্ত্রিক দল ইহাতে আপত্তি করিলে তাহাদের কঠোর-ভাবে দমন করা হইল। সাম্রাজ্যবিস্তারের মধ্যে মুসোলিনি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজিলেন। নিরীহ আবিসিনিয়ার সহিত ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সে বর্বর আক্রমণ আবিসিনিয়া ঠেকাইতে পারিল না। জাতিসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিয়াও কোন ফল হইল না।

মুসোলিনি

নাৎসীবাদ ও হিট্‌লার—ইতিমধ্যে ভার্সাই সন্ধির সর্ত অনুসারে বিজয়ী দেশগুলির ক্ষতিপূরণের দাবী মিটাইতে গিয়া জার্মানীর শা চরমে উঠিয়াছিল। জার্মান মুদ্রা 'মার্কের' ক্রয়শক্তি অতি দ্রুতগতিতে কমিতে লাগিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত সঞ্চয় এভাবে হইল। পরাজয়ের লজ্জায় মুহ্যমান, বুভুক্ষু, বেকার-সমস্যাপীড়িত

জার্মানী ভার্সাই সন্ধিকে সমস্ত আধিব্যাধির জন্য দায়ী করিল। অ্যাডল্‌ফ্ হিট্‌লার নামক জনৈক অস্ট্রিয়াবাসী নিম্নপদস্থ সেনানী ভার্সাই-ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের ব্রত লইয়া নাৎসী দল গঠন করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহুদী ও সাম্যবাদীরাই জার্মানীর দুর্গতির কারণ; তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর জয় হইত। প্রথমে ইহাদের সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। তারপর জার্মানী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যে সকল দেশ হারাইয়াছিল আবার যুদ্ধ করিয়া তাহা অধিকার করিতে হইবে। সমর বিভাগের কর্তৃপক্ষের এবং বড় বড় শিল্পপতির সাহায্যে তিনি ১৯৩৩ সালে জার্মানীর সর্বময় প্রভু হইয়া দাঁড়ান। ইহুদী নির্যাতন করিয়া, শ্রমিক দলন করিয়া, গণতান্ত্রিক দলগুলির কণ্ঠরোধ করিয়া তিনি এক নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করিলেন। যুদ্ধের আয়োজনও চলিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী ইতালী ও জাপানের সহিত মৈত্রী-চুক্তি করিয়া হিট্‌লার কাইজারের মত বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

হিট্‌লার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা—১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার অস্ট্রিয়া গ্রাস করিলেন এবং চেকোস্লোভাকিয়ার কিয়দংশ দাবী করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর অগ্রগতি রোধ করিবার কোন চেষ্টা করিল না; বরং মিউনিক চুক্তি দ্বারা হিটলারের অন্যায় দাবী স্বীকার

করিয়া লইল। রাশিয়া বহুদিন হইতে নাৎসীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে একত্র করিতে চাহিতেছিল; কিন্তু তাহারা মিউনিকে হিটলারের পররাজ্যলোভের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে সে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানীর সহিত এই চুক্তি করিল যে পরস্পর পরস্পরের রাজ্য আক্রমণ করিবে না। ইহার অল্পদিন পরে হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইল। যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরে ইতালী এবং আরো পরে জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল রাশিয়া ও আমেরিকা। এইভাবে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে।

যুদ্ধের ভীষণতা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঢের বেশী ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপিয়া ছয় বৎসর ধরিয়া ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলে। বোমারু বিমানের ব্যাপক প্রয়োগ এই যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বোমারুর নৃশংস আক্রমণে ওয়ারশ, রটার্ডাম, লণ্ডন, কভেন্ট্রি প্রভৃতি সহর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং শত-সহস্র বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়। শেষের দিকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান-বহর জার্মানীর উপর বোমা ফেলিয়া ইহার প্রতিশোধ নেয়। জার্মান ডুবোজাহাজ (ইউ বোট) টর্পেডোর আঘাতে বহু বাণিজ্যতরী ও যাত্রী-জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। জার্মানরা আরও নানারকম মারণাস্ত্র বাহির করিয়াছিল।

এই যুদ্ধকে সামগ্রিক যুদ্ধ (Total war) বলা হয়, কারণ

যুদ্ধরত দেশগুলির সকল নাগরিকই ইহাতে কোন-না-কোন অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং জাতির সমস্ত সম্পদ ও প্রচেষ্টা যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। অধিকৃত দেশগুলিতে জার্মানী ও জাপান অমানুষিক অত্যাচার চালায়। বেসামরিক অধিবাসীদের বেগার

ট্যাঙ্কবাহিনী

খাটিবার জন্য দেশ-বিদেশে স্থানান্তরিত করা হয়, কখনও বা ষড়যন্ত্রের সন্দেহে তাহাদের বন্দীশিবিরে আটক করিয়া নৃশংস নির্যাতনের পর বিষবাষ্প প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ইহুদী, সাম্যবাদী ও দেশপ্রেমিক গেরিলা সৈন্য জার্মানদের হাতে সর্বাপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিত হয়। যুদ্ধ-সমাপ্তির পর ন্যূরেম্বার্গের আদালতে এই সব বন্দীশিবিরের ভয়াবহ কাহিনী প্রকাশ পাইলে পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যায়।

যুদ্ধের ধারা—১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী প্রায় সমগ্র ইউরোপ (ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া বাদে) এবং জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দখল করিয়া ফেলে। ১৯৪১-এর ২২শে জুন হিট্লার অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমণ করেন; কিন্তু এখানে তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। দুই সহস্র মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী এবং রুশ জনগণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তুমুল সংগ্রাম চালায়। পশ্চাদপসরণ
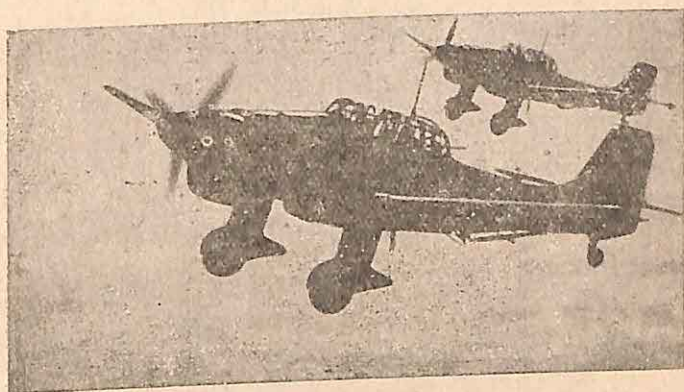
বোমারু বিমান

করার সময় তাহারা সমস্ত কিছু জ্বালাইয়া দিয়া যায়। ইহাকে 'পোড়া মাটির নীতি' বলা হইত। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান বাহিনী মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত চলিয়া আসে। মালয় ও ব্রহ্ম অধিকার করিয়া জাপান ভারত-সীমান্তে হানা দেয়। কিন্তু ১৯৪২-এ স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানদের সাংঘাতিক হার হয়। এখানে প্রত্যেকটি রাস্তা, প্রত্যেকটি বাড়ীর জন্য নির্মম যুদ্ধ চলে। এই সময়ে রুশগণ যে দেশপ্রেম ও বীরত্ব প্রদর্শন করে তাহার তুলনা নাই। এদিকে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে জার্মান বাহিনী মিশর হইতে পিছু হটিয়া লিবিয়ায় সরিয়া যায়।

১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল্ হারবারের মার্কিন নৌ-ঘাঁটি আক্রমণ করিলে আমেরিকা নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যোগ দিল। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের প্রত্যেকটি দ্বীপের জন্য জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংগ্রাম চলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ সিসিলি দিয়া ইতালীতে অভিযান চালায় এবং পর বৎসর ফ্রান্সে অবতরণ করে। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে ইংরাজ ও মার্কিন বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জার্মানী পিছু হটিতে থাকে। প্রথমে মুসোলিনির পতন হয়। মিলানের উন্মত্ত জনতা তাঁহাকে হত্যা করে। রুশ বাহিনী বার্লিনের উপকণ্ঠে পৌঁছিলে হিট্লারও আত্মহত্যা করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। জাপান হয়ত আরও যুদ্ধ চালাইত, কিন্তু আমেরিকা ইতিমধ্যে আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছিল। হিরোশিমা ও নাগাসাকি আণবিক বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইলে ১৪ই আগস্ট জাপান পরাজয় স্বীকার করে।

মিত্রপক্ষের মধ্যে বিরোধ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানেও পৃথিবীতে শান্তি আসিল না। এবার বিরোধ দেখা দিল রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মার্শাল ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিলে রাশিয়া ইউরোপে ধনতান্ত্রিক আমেরিকার প্রভাব বিস্তার হইবে বলিয়া ভীত হয়। আবার পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার হইবে বলিয়া ভীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণজাগরণ ও চীনে সাম্যবাদী সরকার স্থাপন আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের ভয় আরও বাড়াইয়া দেয়। ফলে তাহারা পশ্চিম-

ইউরোপে উত্তর আটলান্টিক সন্ধিসঙ্ঘ (N. A. T. O) ও এশিয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সন্ধিসঙ্ঘ (S. E. A. T. O) নামক দুটি সামরিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানী সম্প্রতি প্রথম সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পৃথিবী আবার দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন শিবিরে যোগ দেয় নাই, বরং উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। প্রাচ্য শিবিরে রুশ বিপ্লবের আদর্শে নূতন সমাজ গঠনের প্রয়াস চলিতেছে। ইহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট হইবে মনে করিয়া পশ্চিমী শিবির প্রতিরোধের আয়োজন করিতেছে। এই না-যুদ্ধ না-শান্তি অচল অবস্থায় নূতন নূতন আন্তর্জাতিক সঙ্কটের উদ্ভব হইতেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—কিন্তু বিরোধ বাড়িলেও সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের (United Nations Organisation) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার চেষ্টাও চলিতেছে। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ এ'রকম একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যুদ্ধের অভিশাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য, মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য, ন্যায় ও সামাজিক প্রগতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন স্যান ফ্রান্সিস্কোতে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র নিউইয়র্কে অবস্থিত। এখন সভ্য-সংখ্যা ষাট। ভারতবর্ষ এই প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যে ও আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। জেনেভার জাতিসঙ্ঘের তুলনায় ইহার ক্ষমতা ঢের বেশী। সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র মিলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সমিতি (General Assembly) গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক সমস্ত সমস্যা বিবেচনা করে এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বস্তিপরিষদে (Security Council) প্রেরণ করে। অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব এই পরিষদের। ইহার পাঁচজন স্থায়ী সভ্য—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। প্রত্যেক সভ্যেরই অন্যদের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বৈঠক

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছিপারষদ নামক আরও দুইটি পরিষদ রহিয়াছে। ইউ. এন. ও-র কয়েকটি শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে—যেমন আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান (U. N. E. S. C. W), বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (W. H. O) ইত্যাদি। তাহাদের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনের ও শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনগ্রসর জাতিগুলির অর্থনৈতিক প্রগতি এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ লক্ষ্য।

খ্রীষ্টাব্দ

- ১৯১৪
  - ২৮ জুন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ নিহত
  - ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুদ্ধ ঘোষণা
  - ৪ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা
- ১৯১৭ ৬ এপ্রিল আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা
- ১৯১৮ ১১ নভেম্বর জার্মানীর সহিত সামরিক সন্ধি
- ১৯১৯ ২৮ জুন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত
- ১৯২২ মুসোলিনির রোম-অভিযান
- ১৯৩৩ হিট্‌লার জার্মানীর অধিনায়ক
- ১৯৩৮ হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাস : মিউনিক চুক্তি
  হিট্‌লার কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস
- ১৯৩৯
  - ২৩ আগস্ট নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি
  - ১ সেপ্টেম্বর হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ
  - ৩ " ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা
- ১৯৪০ ফ্রান্সের পতন
- ১৯৪১ ২২ জুন হিট্‌লার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ
  ৭ ডিসেম্বর পার্ল্ হারবারে জাপানী আক্রমণ :
  আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা
- ১৯৪৩ সিসিলি ও ইতালীতে মিত্রপক্ষের অবতরণ
- ১৯৪৪ রুশ বাহিনীর অগ্রগতি—ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অবতরণ
- ১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক গণ-আন্দোলন, ভারতের স্বাধীনতা ও চীনের বিপ্লব

এশিয়ার গণ-আন্দোলন—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রায় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা জয় করিয়া ফেলিয়াছিল বা অন্যান্য কৌশলে আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিল। কালক্রমে বিজিত দেশগুলি তাহাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হইতে থাকে এবং বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন—ভারতের প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল গ্রাম। সরল সংক্ষিপ্ত জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যই গ্রামে উৎপন্ন হইত। বহির্জগতের উপর নির্ভর করিতে হইত না বলিয়া গ্রামীণ সমাজ কোনদিন রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয় নাই। হিন্দু, পাঠান, মুঘল যে-কোন রাজা রাজত্ব করুন না কেন, তাহাতে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিত না।

বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংল্যাণ্ডের শিল্প-নির্ভর সভ্যতার সংঘাতে কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল। কল-কারখানা নির্মিত হইল, রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার হইল, রাজ্য বিস্তারের তাগিদে সরকারী কাজকর্ম বাড়িল। ইংরাজের সৃষ্টি জমিদারী ও আদালতে অনেকে কাজ পাইল।

ইহার ফলে নূতন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই শ্রেণীর পুরোধা। অসামান্য দূরদৃষ্টি-বলে তিনি বুঝিতে পারেন ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে না পারিলে জাতির উন্নতি হইবে না। এই মর্মে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে তিনি এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু তখনও সরকার কোন শিক্ষানীতি স্থির করিতে পারেন নাই। উইলসন, কোলব্রুক প্রমুখ রাজকর্মচারী ছিলেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী। ভারত সরকারের আইন-সচিব লর্ড মেকলে ইংরাজী ভাষার পক্ষে রায় দিলে এই বিতর্কের অবসান হয়। ইহার পূর্বেই দেশীয় নেতৃগণের চেষ্টায় এবং ডেভিড হেয়ারের পরিকল্পনা অনুসারে ইংরাজী পঠন-পাঠনের নিমিত্ত হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল (১৮১৭)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মুখে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা নূতন এক জগতের দ্বার খুলিয়া দিল। ভেদজীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শিক্ষাহীন সমাজকে নানা দিক দিয়া তাহারা সংস্কার করিতে চাহিল। সাহিত্য, চারুশিল্প ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইতালীয় রেনেসাঁসের মত এক বিরাট আন্দোলন জাগিল এবং বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাহা বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষী এ যুগের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাহার শেষ ধারাবাহক। ধর্ম-জগতে এই যুগ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের মত মহামনীষী ও সাধকের দানে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাহিরে জনসাধারণের অনেকাংশে বৃটিশ শাসন প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক অবনতি ও প্রাচীন শাসন-পদ্ধতি লোপের জন্য বৃটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে দেশের নানা অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ এবং প্রায় সমসাময়িক নীল বিদ্রোহের মধ্যেও এই অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে এই সকল আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। তাহারা আশা করিয়াছিল ইংরাজরা শাসনকার্যে তাহাদের সাহায্য লইবে ও শিল্পবাণিজ্যে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবে। তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না, ছোট ছোট সরকারী চাকুরি ছাড়া তাহাদের ভাগ্যে আর কিছু জুটিল না। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে শাসক জাতির হাতে চলিয়া গেল। বৃটিশ-শাসনের স্বরূপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিলে তাহারা বুঝিল যে ব্যাপক আন্দোলন ব্যতীত তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, দেশেরও উন্নতি হইবে না।
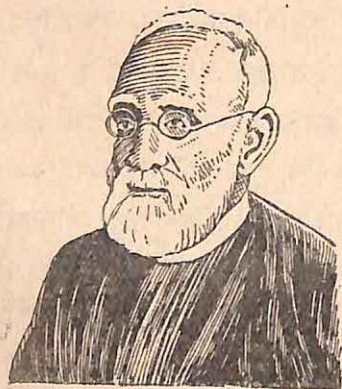
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিবার জন্য ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহার দাবী ছিল সামান্য। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু সুবিধা, দেশীয় বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ, বর্ণ-বৈষম্যের অবসান, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সম্প্রসারণ—ইহার বেশী কিছু কংগ্রেস প্রথমে চাহে নাই।

এ যুগের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ও দাদাভাই নৌরজী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ইংল্যাণ্ডের উদারতন্ত্রী সরকার কংগ্রেসের আবেদন শুনিবে। কোন কোন বিষয়ে সরকারী নীতির ও কাজের মৃদু সমালোচনা করিলেও বৃটিশ-শাসনের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য শিথিল হয় নাই।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—কিন্তু রাজভক্ত কংগ্রেস নেতাদের দাবী বৃটিশ সরকার মানিয়া লইল না। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয় না দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমশঃ অন্য পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী হইলেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলায় চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। ইঁহারা উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং ইংরাজকে হিন্দুধর্মের শত্রু মনে করিতেন। স্বধর্ম রক্ষা এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য বলপ্রয়োগে ইঁহাদের আপত্তি ছিল না। ইঁহাদের প্রভাবে ইংরাজ বিতাড়নের জন্য সন্ত্রাসবাদী দল গঠন আরম্ভ হইল।

লোকমান্য তিলক

বঙ্গ-ভঙ্গ—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইলেন। প্রথমেই তিনি কলিকাতায় রিপন-প্রবর্তিত পৌর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লোপ করিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার আইন দ্বারা

তিনি দেশের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা সরকারের অধীন করিতে চাহিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও প্রতিবাদ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীকে দুর্বল করিবার জন্য শাসনকার্যের সুবিধার অছিলায় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করিলে দেশে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। লোকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে এবং স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য সমবায় সমিতি ও স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত লোকের মুখে মুখে ঘোরে। সভায় সভায় বঙ্গ-ভঙ্গ রদের শপথ গৃহীত হয়। সরকার যখন নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় লইল তখন সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাচারী শাসকদের হত্যা করিয়া ইহার উত্তর দেয়। ক্ষুদিরামের মত কত বীর যুবক সানন্দে ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দিলেন। এই দেশব্যাপী আন্দোলন ও দুঃখবরণ একেবারে বিফল হইল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইল।

রবীন্দ্রনাথ

প্রথম মহাযুদ্ধঃ শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব মর্লি ও বড়লাট মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাহাতে নরমপন্থীরা মোটামুটি খুসী হন। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ নষ্ট করিবার জন্য আইনসভাসমূহে মুসলমানদের জন্য

পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোস্লেম লীগের জন্ম ভবিষ্যৎ ভারতভাগের সূচনা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসীরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া উঠে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাবের গদর দল এবং বাংলার যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। কোন কোন বিপ্লবী বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন।

১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগের মধ্যে একটা আপোষ হয়। পর বৎসর ভারত-সচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেন ভারতকে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইবে। কিন্তু দমনমূলক রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে এক নিরস্ত্র জনতা পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালান হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ-প্রদত্ত সম্মান 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিয়া সমগ্র দেশের গভীর বেদনা ও প্রতিবাদকে রূপ দেন। মণ্টেগু কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারে প্রদেশগুলি কিছুটা আত্মশাসনের অধিকার পায় ও নির্বাচনের ভিত্তি ব্যাপকতর হয়। কিন্তু নির্বাচিত দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই দেওয়া হয় নাই। দেশীয় রাজ্যগুলিও পূর্বের মত ইংরাজদের অধীনে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব—এই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার জন্ম হয় সৌরাষ্ট্রের পোরবন্দরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-ব্যবসা করিতে গিয়া তিনি শ্বেত প্রভুদের বর্ণবিদ্বেষ দেখিয়া ব্যথিত হন। সেখানে নির্যাতিত কৃষ্ণকায়দের অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাহার নাম সত্যাগ্রহ—অর্থাৎ

সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকিয়া অহিংস উপায়ে অবিচারের প্রতিরোধ। ইহাতে সাফল্য লাভ করিয়া গান্ধীজী দেশে ফেরেন ও কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁহার নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অহিংস গণ-আন্দোলন সুরু হয়। একদিন কংগ্রেস ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। নূতন নেতার প্রভাবে ইহা ক্রমশঃ গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন—প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য মিত্রশক্তির নিকট পরাজয়ের ফলে তুরস্কের খলিফার রাজ্য গিয়াছিল। তিনি ছিলেন মোস্লেম জগতের ধর্মগুরু। তাই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয় ও ইংরাজ-বিরোধী খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মিশিয়া যায়। ছাত্রেরা বর্জন করে স্কুল-কলেজ, উকিলরা আদালত; বাজারে বাজারে চলে হরতাল; সভা-সমিতি ও পিকেটিং-এ অন্তঃপুরের মহিলারাও যোগ দেন। শেষে স্থানবিশেষে কেহ কেহ হিংসার আশ্রয় লইলে গান্ধীজী তখনকার মত আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন।

গঠনমূলক কর্ম ও পূর্ণ স্বরাজের দাবী—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মণ্টেগু-প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার কংগ্রেস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না; তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে

স্বরাজ্য দল বিধান সভায় ঢুকিয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে থাকে। গান্ধীজী নিজে খাদি ও গ্রাম-উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে ও গণসংযোগের কাজে মন দেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার শাসন-সংস্কারের কথা বিবেচনার জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাইমন কমিশন ভারতে আসিলে সর্বত্র তাহার বিরুদ্ধে হরতাল হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বরাজের দাবী উত্থাপন করেন। সে দাবী বৃটিশ সরকার মানিয়া লইল না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন—ইহার ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন স্থুরু করে। সর্বত্র লবণ আইন অমান্য হইতে থাকে। গান্ধীজী নিজে লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য ডাণ্ডী যাত্রা করেন। আইন ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ভারতে প্রবল বিক্ষোভ সত্ত্বেও সর্বদলীয় প্রতিনিধি লইয়া শাসন-সংস্কারের জন্য তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বিলাতে ডাকা হয়। গান্ধীজী শেষের দিকে কারামুক্ত হইয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৈঠকে যোগ দিতে যান বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় ফিরিয়া আসেন। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায়

আন্দোলন চলে এবং শত-সহস্র নরনারী আবার কারাবরণ করে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও আবার সজাগ হইয়া উঠে। সশস্ত্র বাঙালী যুবকেরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে।

শাসন-সংস্কার—দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের চাপে ইংরাজ শাসকেরা বিচলিত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তন করে। কিন্তু ইহাতেও সর্বোচ্চক্ষমতা ও দায়িত্ব বিদেশী বড়লাটের হাতে থাকিয়া যাওয়ায় জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষ কমে না। বিভিন্ন আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির অনুপাত সম্বন্ধে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যে মীমাংসা করেন তাহাও অনেকের মনঃপূত হয় নাই। তবে কংগ্রেস ইহা পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করে এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে জয়ী হইয়া ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু কেন্দ্রের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগের বিরোধিতায় তাহা চালু করা গেল না।

আগস্ট বিপ্লব—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া ভারতকে যুদ্ধরত রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। এই মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থার প্রতিবাদে কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে। কিন্তু জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কংগ্রেস দেশরক্ষায় বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হয়। আলোচনার জন্য ইংল্যাণ্ডের চার্চিল সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠান, কিন্তু তিনি কংগ্রেসকে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব দিতে আপত্তি করিলে কংগ্রেস ইংরাজদের অবিলম্বে ভারত ছাড়িতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাকে বন্দী করা হয় (আগস্ট, ১৯৪২)। এই দমন-নীতির প্রতিবাদকল্পে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে।

নেতৃহীন জনগণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া, থানা দখল করিয়া, এমন কি স্থানে স্থানে জাতীয় সরকার গঠন করিয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলার বীর সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু ইহার কিছুদিন পূর্বে ইংরাজ প্রহরীর চক্ষু এড়াইয়া জার্মানীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে সিঙ্গাপুর পৌঁছিয়া জাপানের সহযোগিতায় ভারতের জাতীয় বাহিনী (I. N. A.) গঠন করেন। ইম্ফলে ইংরাজ ও ভারতের জাতীয় বাহিনীর তুমুল সংগ্রাম হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃটিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। ভারতবর্ষে এদিকে অতি কঠোর ভাবে আগস্ট আন্দোলন দমন করা হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারত-বিভাগ ও স্বাধীনতা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার স্থাপিত হয়। প্রধান মন্ত্রী অ্যাট্‌লি ঘোষণা করেন ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতীয় নেতাদের সহিত ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা করিতে আসেন। মোস্লেম লীগের নায়ক মিঃ জিন্না মুসলমানদের জন্য এক পৃথক রাষ্ট্র বা পাকিস্তান দাবী করিতেছিলেন। কংগ্রেস চিরদিন জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের পক্ষে দেশবিভাগের এই বিচিত্র প্রস্তাব গ্রহণ করা সহজ
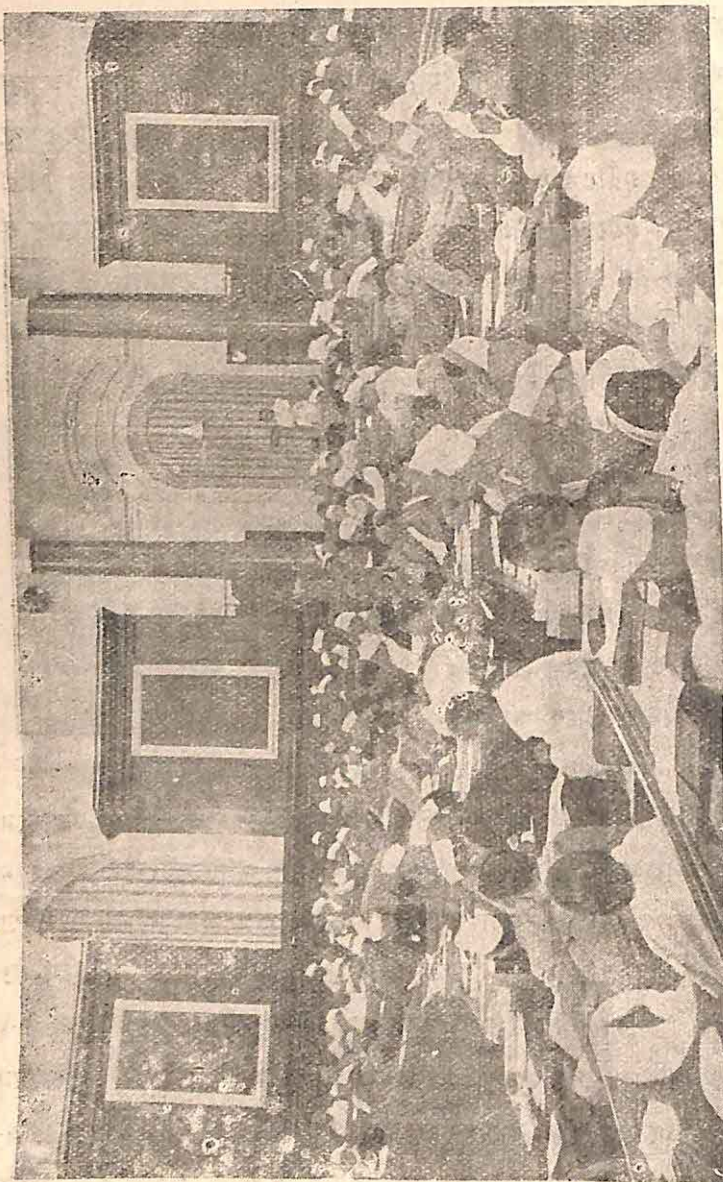
ভারতীয় সংবিধান সভার এক বৈঠক

ছিল না। বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ভারতের ঐক্য বজায় রাখিয়া ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব করিলে ইহা কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়। কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করিল। হাজার হাজার নিরীহ নরনারী বীভৎসভাবে নিহত বা আহত হইল; ততোধিক লোক সর্বস্ব হারাইল। লীগের পাকিস্তান দাবী মানিয়া না লইলে দাঙ্গা থামিবে না মনে করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য কংগ্রেস ভারত-বিভাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হইল।

জিন্না

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের বড়লাট হইলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন। পূর্বেই এক সংবিধান সভা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আহূত হইয়াছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল, তবে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারত থাকিয়া গেল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী জাতির জনক গান্ধীজী এক হিন্দু সাম্প্রদায়িক আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলেন। কংগ্রেস ও দেশের নেতৃত্বভার এখন তাঁহার শিষ্য জওহরলাল নেহরুর হাতে। তিনি কেবল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় মহাজাতির অবিসংবাদিত জননেতা নহেন, পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি—পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসংখ্যার
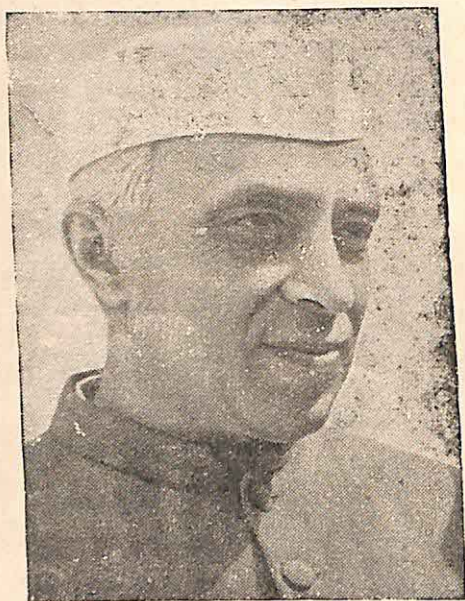
জওহরলাল নেহরু

দিক হইতে ভারত এখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি করিয়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রে এবং প্রত্যেকটি রাজ্যে জনসাধারণের আস্থাভাজন সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশ পুনর্গঠনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের শিল্প ও কৃষি আশানুরূপ উন্নতি

লাভ করিয়াছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। দেশের শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইতেছে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। ভারতকে কল্যাণ রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত করাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য। বিগত কয়েক বৎসরে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি।

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরুর নিরপেক্ষতার নীতি (Policy of non-alignment) অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলি দুইটি সংঘে (Bloc) শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পড়ে। একটির নায়ক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অপরটির নায়ক সোভিয়েট রাশিয়া। স্বাধীন ভারত এই দুইটি সংঘের কোনটিতে যোগদান করে নাই, অথচ উভয় সংঘের সহিত মিত্রতা ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়াছে। উভয় সংঘ হইতেই ভারত আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভারত আক্রমণ করিলে উভয় সংঘ হইতেই ভারত সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছে। উভয় সংঘই বুঝিতে পারিয়াছে যে ভারত যথার্থ শান্তিকামী, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে চায়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (United Nations) ভারত একটি সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে। ভারত একবার স্বস্তি পরিষদের (Security Council) সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিল। কোরিয়া এবং ইন্দোচীনে যুদ্ধাবসানে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন—ভারত যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশও তখন বৈদেশিক

শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিতেছিল। মিশর, সিরিয়া, ইরাণ প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রে এই চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়।

ইরাণে দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার প্রভাব প্রবল ছিল। দেশটির প্রধান সম্পদ পেট্রোলিয়াম। কিন্তু তাহার কর্তৃত্ব ছিল এক বিলাতী কোম্পানীর হাতে। তাহারা সরকারকে কিছু নজরাণা দিলেও শোষণ-লব্ধ প্রচুর অর্থ ইংল্যাণ্ডে লইয়া যাইত। রেজা খাঁ পহ্লবীর নেতৃত্বে ইরাণ আগেই কিছুটা স্বাধীন হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের পর ইরাণ তৈলসম্পদ জাতীয়করণ করিয়াছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তে এখন সেখানে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলিতেছে।
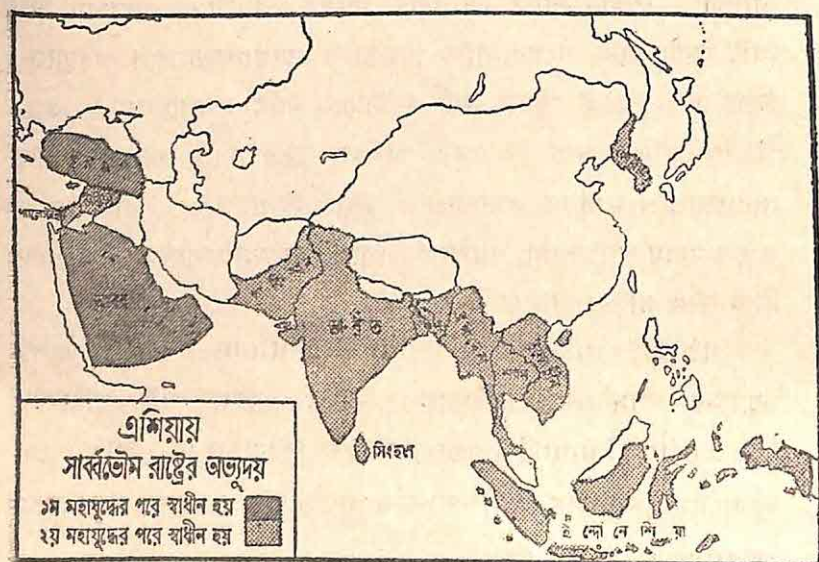
সুলতানী আমলে তুরস্ক নামে স্বাধীন হইলেও দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রভাবাধীন ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখানে জার্মান

প্রভাব প্রবল হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত তুরস্ক কামাল পাশার নেতৃত্বে ইউরোপীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শক্তিশালী স্বাধীন সরকার স্থাপন করে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরব দেশগুলি (সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা চাহিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন তাহাদের বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে হয়। তাহারাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা পাইয়াছে।

মিশর নামে তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ হইলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডের অধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই মিশরে ইংরাজ প্রভাব কমিতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই মিশরের ঘাঁটি ছাড়িতে ইংরাজরা আপত্তি করিতেছিল। সুয়েজ খাল অঞ্চলে তাহাদের সামরিক প্রভুত্ব ছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয়রা ঐ অঞ্চল হইতে ইংরাজদের সরাইতে পারিয়াছে।

ইহুদীদের কোন আপন দেশ ছিল না। যুগের পর যুগ মধ্য প্রাচ্যে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহারা নির্যাতিত হইয়াছে। এখন তাহারা ইজ্‌রায়েলে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তবে আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত তাহাদের বিরোধ লাগিয়াই আছে।

আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে। কেনিয়ায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে ঘটিল সশস্ত্র বিদ্রোহ, বিদ্রোহী দলের নাম 'মাউ মাউ'। ফলে কেনিয়া স্বাধীন হইল। ফরাসী আফ্রিকায় প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে টিউনিসিয়া, অ্যালজিয়ার্স ও মরক্কো ফরাসী কবলমুক্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ গোল্ড কোস্টে (ঘানা) আসিয়াছে স্বায়ত্তশাসন। আফ্রিকার সর্বত্র

কৃষ্ণকায় আদিবাসীরা এতদিন পর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে পশ্চাদপসরণ করিবার সময় জাপান প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যায়। জনসাধারণ জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল; এখন সেই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূর্বপ্রভু ওলন্দাজ, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদিগণের প্রত্যাবর্তনেও তাহারা বাধা দিতে লাগিল।

ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয়। ফরাসীরা ইন্দোচীন ও ইংরাজরা মালয় উপদ্বীপ ছাড়িতে রাজি না হওয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ তাহার নেতৃত্ব সাম্যবাদী দলের হাতে চলিয়া যায়। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ ও বোমা বর্ষণ করিয়াও মালয়ের আন্দোলন দমন করা যায় নাই। সম্প্রতি মালয়বাসীরা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইয়াছে। ইন্দোচীনে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী ভিয়েট মিনের ও ফরাসীদের নেতৃত্বে ভিয়েট নামের গৃহযুদ্ধ প্রায় আট বৎসর ধরিয়া চলে। জেনেভা বৈঠকের ফলে গৃহযুদ্ধের বিরতি ঘটে। ইন্দোচীন সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এখানেও পরাভূত হইয়াছে।

কোরিয়া দেশও উত্তরে কমিউনিস্ট ও দক্ষিণে জাতীয়তাবাদী সরকারের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। কয়েক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধেও কোরিয়ার সমস্যার সমাধান হয় নাই।

স্বাধীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল পরাধীন জাতি ইউরোপীয়

জাতিসমূহের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে তাহাদের সকলের প্রতিই ভারত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এই সহানুভূতির মূল্য কম নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যখনই এই সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে তখনই ভারত সাম্রাজ্যবাদের অবসান দাবী করিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে ভারত অকুণ্ঠভাবে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়াছে। পৃথিবীর জনমত গঠনে এই সমর্থন যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। মিশর যখন সুয়েজ খালে ইংরাজের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য সংযুক্ত ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন ভারত মিশরের ন্যায়সঙ্গত দাবী দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ইন্দোচীনে ফরাসী অধিকারের বিলোপ ঘটাইলে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সমগ্র পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে মালয়বাসীরা ভারতের অকুণ্ঠ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভারত হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরোধিতা করিয়াছে।

চীনে সাম্যবাদের জয়—এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—চীনে সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র স্থাপন। জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সাম্যবাদী দল কুয়োমিন্টাঙের সহিত হাত মিলাইয়াছিল। জাপান পরাজিত হইলে তাহারা চীনে ক্ষমতা অধিকারের জন্য কুয়োমিন্টাঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কুয়োমিন্টাং হইয়া পড়িয়াছিল ধনী জমিদার ও পুঁজিপতির সরকার, চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণীর দারিদ্র ও দুর্দশা সম্বন্ধে তাহাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। এজন্য এই সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ছিল।

এই অসন্তোষের সুযোগ লইয়া মাও-সে-তুঙ, জনগণের নেতৃত্ব দাবী করিলেন। তিনি শুধু সংখ্যাল্প শ্রমিকের উপর নির্ভর করেন নাই। চীনের বিপ্লবী শক্তি তার কোটি কোটি কষ্টসহিষ্ণু কৃষকের মধ্যে নিহিত—এই বিশ্বাসে মাও তাহাদের গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। সম্মুখ সমরে বারবার জিতিয়াও চিয়াং কাই-শেক ইহাদের দমন করিতে পারিলেন না। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে চীনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়িয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইতে হইল। সেখানে তাঁহার রক্ষক হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি। চীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

নব্যচীনের মতবাদ সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহা সোভিয়েত রাশিয়ার মতবাদের অনুরূপ নহে। চীনের বিশেষ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাও তাহার কিছু অদল-বদল করিয়াছেন। চীনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। তবে এখনও সর্বত্র রাশিয়ার মত যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই, ধনিক-শ্রেণীকেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয় নাই।

সাম্যবাদী চীনের পররাষ্ট্রনীতি শান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথমেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই ঘোষণাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া শান্তিকামী ভারত চীনের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করে। কিন্তু চীন তিব্বত অধিকার করিয়া তিব্বতীয় জনগণের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। ক্রমশঃ চীন বিশ্বাসঘাতকতার আড়ালে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের সীমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কাশ্মীরের অন্তর্গত লাদাকে একটি বৃহৎ ভূখণ্ড চীন সামরিক বলে অধিকার করে। ভারত এখনও শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান

করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পররাজ্যলোভী চীন ভারতের বন্ধুত্ব তুচ্ছ করিয়া ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নেফা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লাদাক আক্রমণ করে। ভারত এই আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ করে। চীনের সৈন্যবাহিনী খানিকটা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুনরায় যে কোন মুহূর্তে চীনের আক্রমণ ঘটিতে পারে। সেই সম্ভাবিত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারতের সর্বত্র সামরিক প্রস্তুতি চলিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ সুস্পষ্টভাবে চীনের পররাজ্যলোভের নিন্দা করিয়াছে এবং ভারতের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাইয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৮৫	জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন
১৯০৫	বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন
১৯০৬	মোস্লেম লীগের জন্ম
১৯০৯	মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার
১৯১৭	মণ্টেগুর ঘোষণা
১৯১৯	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড; মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কার
১৯২০	মহাত্মা গান্ধীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন
১৯২৯	পূর্ণ স্বরাজের দাবী
১৯৩০	দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন
১৯৩০-৩৩	গোলটেবিল বৈঠক
১৯৩৫	ভারত-শাসন আইন
১৯৩৭	কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ
১৯৪২	আগস্ট বিপ্লব
১৯৪৭	ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ

খ্রীষ্টাব্দ	—১৯৪৬-৫৪	ইন্দোচীনে যুদ্ধ, মালয়ে বিদ্রোহ
	—১৯৪৯	ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ—চীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা
	—১৯৫০	ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
	—১৯৫৪-৫৫	জেনেভা-চুক্তি ; ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি ; ইরাণে তৈল-সমস্যার সমাধান
	—১৯৬২	চীনের ভারত আক্রমণ।

আধুনিক পৃথিবী

•• অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাস বই ••